মেধাবী নীলিমা

আজহারউদ্দীন খান্

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৯৭ । জানুয়ারী ১৯৯০

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীমৃণালকান্তি রায়
সাহিত্যশ্রী
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
মেমোরিয়াল আর্ট

মুখপাত

'মেধাবী নীলিমা' ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়ন। তাঁর সম্পর্কে এটি আমার তৃতীয় বই। প্রথম বই 'বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' তাঁর জীবদ্দশায় বেরিয়েছিল এবং বস্তুতপক্ষে ঐ গ্রন্থটি ছিল উভয় বাংলায় তাঁর ওপর প্রথম পরিচয়মূলক গ্রন্থ। দ্বিতীয় বই 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্যসাধক চরিতমালা সিরিজের জন্য পরিষদের অনুরোধে লিখে দিয়েছিলাম বইটির প্রুফ আমাকে দেখানো হয়নি, ফলে বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ তাতে রয়ে গেছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে 'পরিচয়' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীদেবেশ রায় ২৪. ৫. ১৯৮৫ তারিখে আমাকে একটি চিঠি লেখেন -"আমাদের আগামী শারদীয় সংখ্যায় শহীদুল্লাহ সাহেবের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখতে আপনাকে অনুরোধ করছি। তাঁর জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষে গত বছরই এটা হয়ত আমাদের করণীয় ছিল। এবার আমরা আপনাকে দীর্ঘ জায়গা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি -যদি অধ্যাপকের সারাজীবনের কীর্তি সকলকে আপনি একবার মনে করিয়ে দেন। প্রবন্ধটি শুধুই জীবনপঞ্জী না হয়ে তাঁর প্রধান রচনাগুলির অন্তর্লীন দর্শনেরও ভাষ্য হয়ে ওঠে যদি, আমাদের আরো ভালো লাগবে। আপনি আমাদের দু' লাইন লিখে জানাবেন -আপনি সম্মত আছেন কিনা আর সম্মত থাকলে কতটা জায়গা আপনার প্রয়োজন হতে পারে?" এই অনুরোধের ফলে তাঁর সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি সেটি 'আচার্য শহীদুল্লাহ' নামে পরিচয় শারদীয় ১৯৮৫ (১৩৯২ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃ ৬৫-১০৭)। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী প্রবন্ধটিকে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তখন খুব বেশী উৎসাহবোধ করিনি কারণ তখন আমি নতুন দুটি বই লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে 'সাহিত্যশ্রী'র শ্রীতপনকুমার ঘোষ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জন্মশতবর্ষে একটি বই বের করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর জন্মশতবর্ষ নিয়ে এপার বাঙলায় তেমন তৎপরতা দেখা দেয় নি বলেই তপনবাবুর অনুরোধকে ফেলতে পারিনি। বইটির পাণ্ডুলিপি ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলাম—এতদিনে সেটি সূর্যের আলো দেখলো। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে অনেকদিন আগে তবু কিছু না হওয়ার থেকে শতবর্ষকে উপলক্ষ করে বিলম্বে প্রকাশিত হলেও কিছু যে হল এটাই যথেষ্ট। এটি যেমন প্রকাশকের শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয় তেমনি এপারের প্রকাশন জগতে তিনি আদর্শ স্থাপন করে কলঙ্কমোচন করলেন। এই অবকাশে এক শব্দবিদের জন্ম শতবর্ষের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ আর এক ভাষাচার্যের জন্মশতবর্ষে নিবেদন করে আমি আমার ভালবাসার বৃত্তকে পূর্ণ করে দিলাম।

বর্তমান বইটি পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। শেষ অধ্যায়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের রচনাপঞ্জী দিয়েছি যা তিনি তাঁর জীবিতকালে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পূর্বের দুটি গ্রন্থ রচনায় সেটি সহায়তা করলেও তাঁর রচনাপঞ্জী আমি প্রথম গ্রন্থে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়েছিলাম, দ্বিতীয় গ্রন্থে কালানুক্রমিক সাজিয়ে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছিলাম। বর্তমানে গ্রন্থে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যেমনটি পাঠিয়েছিলেন তেমনটি হুবহু ছেপে দিলাম —৩৮ সংখ্যা পর্যন্ত বইয়ের নাম তিনি দিয়েছিলেন, ৩৯ থেকে ৪৪ সংখ্যক বইয়ের নাম আমি সংযোজিত করেছি, এগুলি অধিকাংশ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। এছাড়া এই অধ্যায়ে তাঁকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এমন চিঠিগুলি দিয়েছি যা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ব্যবহার করিনি। এরই সঙ্গে বিস্তৃত পরিচিতিসহ বিভিন্ন জনকে লিখিত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ১৮ খানা চিঠি দিয়েছি যেগুলি তাঁর জীবনের কয়েকটি দিকের কথা উদ্ঘাটিত করে। ডাঃ হেদায়েতুল্লাহ তাঁর পিতৃদেব মুহম্মদ নুরুল্লাহকে লিখিত ৬ খানা চিঠির অনুলিপি দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। সর্বসাকুল্যে বর্তমান গ্রন্থে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৪ খানা চিঠি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৩ খানা চিঠি ও শহীদুল্লাহ্ লিখিত ২০ খানা চিঠি সংকলিত হল। বাংলাদেশ থেকে 'পত্রসাহিত্যে ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নামে ৮০ খানা চিঠির যে সংকলন বেরিয়েছে (মার্চ ১৯৮৭) তাতে একখানা বাদে বর্তমান গ্রন্থের আর কোন চিঠি উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। 'বিবাহের মন্ত্রমালা' নামে যে সংকলন দিয়েছি সেটি এতদিন শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল সেটি সর্বসাধারণের মধ্যে আনার কৈফিয়ৎ হচ্ছে যে ইসলাম পতি ও পত্নীর পবিত্রভাবকে কত গুরুত্ব দেয় সেটি গোচরীভূত করা। তাঁর রচিত 'আমার সাহিত্যিক জীবন' প্রবন্ধটি সংযোজন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে ক্ষেত্রে কৃতী হয়েছিলেন সেটির অংকুর ছোটবেলা থেকেই দেখা গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির প্রশ্নমালার উত্তর তিনি যা দিয়েছিলেন সেটি তাঁর "আমাদের সমস্যা" গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে তুলে দিয়েছি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ভূমিকা এবং প্রেরণাদানের কথা আরও স্পষ্ট হবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আইনক্লাসের সহপাঠী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ছিলেন। আমি যখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে প্রথম বই লিখি তখন ড. মজুমদারকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তরে তিনি একটি ছোট নিবন্ধ লিখে পাঠান। প্রথম দুটি বইতে তার কিছু কিছু অংশ আমি ব্যবহার করেছিলাম। আজ ড. মজুমদারও পরলোকে। বন্ধু সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি-স্মরণ পুরোটাই বর্তমান গ্রন্থে সংযুক্ত করে দুজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আপাতত শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে এটিই আমার শেষ বই। অবিরল-

ভাবে এবারও শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র জনাব মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ প্রীতিপূর্ণ সহায়তা করে আমাকে তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ করেছেন।

মুখপাত বন্ধ করার আগে আর একটি কথা আছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে প্রতিটি গ্রন্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রতিটি গ্রন্থই প্রতিটির সম্পূরক কারণ তিনটি বইয়ের বিষয়বস্তু ঐ একজনই। কাজেই একজনকে জানতে হলে একটি নয় তিনটিই যেন পাঠক হিসেবে আপনার সদয় দৃষ্টির মধ্যে থাকে এইটুকু প্রার্থনা জানিয়েই আজকের মত আমাব ছুটি॥

উৎসর্গ

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
জন্মশতবর্ষে প্রণাম

উদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

বাংলাদেশের

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

স্বরবর্ণ অংশ

ও

ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ

[ক—ঙ]

প্রসঙ্গ-কথা ও ভূমিকাসহ

প্রধান সম্পাদক

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাংলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা

নামপত্র

প্রচ্ছদ

[illegible]
[illegible]
P.O. [illegible]
(West Bengal)
India

From
Dr. M. Shahidullah
79, Begum Bazar Road
Dacca
(East Pakistan)

বাংলা ও ইংরাজী হস্তাক্ষর

TRADITIONAL CULTURE IN EAST PAKISTAN

★

DR MUHAMMAD SHAHIDULLAH
M. A. B. L. (CAL) ; D. LITT. (PARIS) , DIPL. PHON. (PARIS)
Formerly Dean of the Faculty of Arts, and Head of the Department of Bengali & Sanskrit, University of Dacca & Rajshahi ; Editor, Bengali Dictionary, Bengali Academy.

AND

PROF. MUHAMMAD ABDUL HAI
M. A. (DACCA) , M. A. (LONDON)
Head of the Department of Bengali & Sanskrit, University of Dacca

★

Published by
DEPARTMENT OF BENGALI ▪ UNIVERSITY OF DACCA

নামপত্র

PEARLS
From
THE HOLY PROPHET

Translated from Original Sources

By

Al-Haj Allama Dr. Muhammad Shahidullah

Hilal-i-Imtiaz

M.A., B.L. (Cal.), D.Litt., Dipl. Phon. (Paris)

Chevalier de l' Ordre des Arts et des Lettres (France)

Vidyabachashpati

RENAISSANCE PRINTERS

নামপত্র

বাংলা সাহিত্যের কথা

[প্রথম খণ্ড – প্রাচীন যুগ]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌,

এম এ, বি এল (কলিকাতা) ডি. লিট, ডিপ্লো ফোন (প্যারীস), বিদ্যাবাচস্পতি।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

প্রধান সম্পাদক, আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ,

বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স

নামপত্র

Tales from Quran

By

Al-Haj Allama Dr. Muhammad Shahidullah
Hilal-i-Imtiaz
M.A., B.L. (Cal.), D.Litt., Dipl. Phon. (Paris)
Chevalier de l' Ordre des Arts et des Lettres (France)
Vidyabachashpati

RENAISSANCE PRINTERS

নামপত্র

হজ্জের ও রওযাঃপাকের যিয়ারতের দো'আ দরূদ
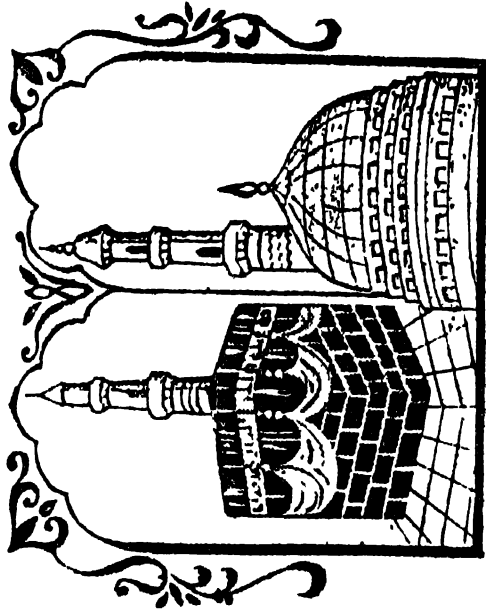
আলহজ্জ্ব আল্লামা
ডক্টর মুহম্মাদ শহীদুল্লাহ্ মুজাদ্দিদী

প্রচ্ছদ

মহাবাণী

(কুরআনুল করীমের আমপারা অংশ)

আল্‌হাজ্জ আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্,
এম. এ., বি. এল. (কলিকাতা), ডিপ্লো-ফোন., ডি. লিট. (প্যারিস)
সেভলেয়র এ্যা অর্দ'র দ্য আর্টস এত্ দ্য লেতর্স' (ফ্রান্স)
বিদ্যাবাচস্পতি, হিলাল-ই-ইমতিয়াজ (পাকিস্তান)

অনূদীত

ও

প্রাক্তন সভাপতি, আঞ্জুমানে ই-'ঈশয়াতে মুজদিদীয়া
আল্‌হাজ্জ হাফিজ সৈয়দ এ.বি. বশীরউদ্দীন
সাহেবের ভূমিকা সম্বলিত

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ॥ ঢাকা

নামপত্র

প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য পূর্ববঙ্গের ডিরেক্টার বাহাদুর
কর্তৃক অনুমোদিত (ঢাকা গেজেট ২৭-১২-৫১)।

রুবা'ইয়্যাত-ই-'উমর খয়্যাম

মূল পারসী হইতে

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল,
ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্ (প্যারিস)

কর্তৃক অনূদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৫২ ইং

[মূল্য ১॥০ টাকা

নামপত্র

প্রচ্ছদ

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রচ্ছদ

BUDDHIST MYSTIC SONGS

Oldest Bengali
and other eastern vernaculars

Translated w th annotat ons by
DR MUHAMMAD SHAHIDULLAH

BENGALI ACADEMY
Dacca (East Pakistan)

নামপত্র

LES
CHANTS MYSTIQUES
de KANHA et de SARAHA

LES DOHA-KOSA

(t s apul ramas av c les versions tibétaines)

ET

LES CARYA

(en v ux bengali)

avec introductio vocabulaires et notes

édités et traduits

PAR

M SHAHIDULLAH, M A (Cal)

D cteur de Universi té de Paris,
Dip né de l Institut de Phonétique, Paris
Maître de C nfé ences à l Université de Dacca, Bengale

Md Shahidullah
12 5 52

ADRIEN MAISONNEUVE
5 Rue de Tournon, 5
PARIS VI
1928

ন মপত্র

পদ্মাবতী

মালিক মুহম্মদ জায়েসীর পদ্মোবত অবলম্বনে
মহাকবি আলাওল বিরচিত

সম্পাদনায়

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম-এ., বি-এল. (কলিকাতা), ডি. লিট., ডিপ্লো. ফোন (প্যারিস), বিদ্যাবাচস্পতি,
Chevalier en order des arts et des lettres (France)
প্রফেসর এমিরিটস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।
প্রধান সম্পাদক, বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক বাংলা অভিধান
ও ইসলামিক বিশ্বকোষ।

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ॥ ঢাকা

নামপত্র

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার
এবং ঢাকা রাজশাহী যশোহর ও কুমিল্লা বোর্ডের হাই-স্কুল ও
হাই-মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার ভূতপূর্ব পরীক্ষক ও পরীক্ষক
ঢাকা এডুকেশন বোর্ডের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কমিটির সভ্য ও পরীক্ষক,
করাচী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ,
বগুড়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের পরীক্ষক মণ্ডলী
একাডেমীর প্রধান সম্পাদক

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল্
ডিপ্লো, ফোন, ডি-লিট, (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি
প্রণীত

নামপত্র

১

জীবন বৃত্ত

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণালব্ধ ফলকে যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্মানে গৌরব-মণ্ডিত করেছেন এবং দেশ ও জাতিকে ব্যর্থতাবোধ থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনপ্রত্যয়ী করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অন্যতম। তিনি সারাজীবন বাংলা ও বাঙালীর হিতের জন্য অনন্যভূমিকা পালন করেছিলেন তার প্রতিদানে আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষে এপার বাঙলায় কিছুই করিনি। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের মূর্তির নীচে ফরাসিতে একটি কথা খোদিত আছে। তার মর্মার্থ হল —'তাঁর গৌরবের অভাব ছিল না, তাঁর অভাব ছিল আমাদের গৌরবে।' শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকা প্রসঙ্গে ঐ কথা মনে পড়ে। এপার বাঙলায় তিনি নামে মাত্র আছেন -তাঁর নাম কতিপয় শিক্ষিতজন জানেন। প্রতিদিনের সজাগ অধীতি, সমকাল সম্পর্কে সুতীক্ষ্ম চেতনা, বিদ্যুতের মতো দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রসন্ন প্রসারিত উন্নত উদার হৃদযের মানুষটি তাঁর স্বদেশবাসী ও স্বভাষীর কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদার শতাংশের একাংশও পাননি। অথচ তিনি একদিন এপার বাঙলার সন্তান ছিলেন।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু মুনসী পরিবারে। পিতার নাম মুনসী মফিযুদ্দীন আহমদ, মাতার নাম হুরুন্নেশা খাতুন। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে ঢাকা যেতে হয়েছিল সেই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে চালু হয়। প্রধানত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯২৪) আগ্রহেই ওকালতী ত্যাগ করে দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মীরূপে 'শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক'রূপে কাজ শুরু করেন (১৯১৯, ১৫ জুন)। তার আগে আইন পাশ করে (১৯১৪) মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর (১৮৭৫-১৯৫০) অনুরোধে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে এক বছর প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন (১৯১৪-১৯১৫ মার্চ)। শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ১৯১৫ এপ্রিল থেকে বসিরহাট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতিতে তিনি মন বসাতে পারেন নি, সরকারি চাকরী করার বয়সও তখন পার হয়ে গেছে। আশুতোষই তাঁকে বিদ্যাভিমুখী করেছিলেন। ইতিমধ্যে সংসার বড় হওয়ায় এবং দায়িত্ব বাড়ায় তাঁকে বাধ্য হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উৎসাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পড়ানোর জন্য লেকচারার পদে যোগ দিতে হয়। ঢাকায় চলে গেলেও জন্মভূমির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হয়নি। দেশবিভাগের আগে ত হামেশাই ছুটিছাটায় আসতেন, দেশবিভাগের পরও সুযোগ-সুবিধে পেলেই একবার জন্মভূমি ঘুরে যেতেন। গ্রামের

মানুষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। আসা-যাওয়ার ব্যাপারে যখন কড়াকড়ি আরোপিত হল তখন ইচ্ছে থাকলেও আসা সম্ভবপর হত না। মনের বেদনাকে তিনি মনে-মনেই বয়ে বেড়িয়েছেন। নিজের বাড়ির নাম জন্মভূমির নামের সঙ্গে মিলিয়ে 'পেয়ারা হাউস' রেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন যখন দীনেশচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করেন। সিণ্ডিকেট রামতনু লাহিড়ী পদে খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে বহাল করেন। তাহলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তারূপে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় যাবতীয় সম্মান দক্ষিণা নিয়মিত পেয়েছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে তাঁর সংযোগ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে-চেষ্টা সতীশচন্দ্র ঘোষ যতদিন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ততদিন তা করেছেন।

Indian Council for Cultural Relations-এর সাধারণ সভায় (১৫ মার্চ ১৯৬২) তাঁকে সম্মানীয় ফেলোশিপ দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের আপত্তিতে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সরকারকে একাধিক চিঠির মাধ্যমে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কোন ফল হয়নি। এই বিষয় নিয়ে পাকিস্তান সরকারকে তাঁর লিখিত অনেকগুলি চিঠির মধ্য থেকে একটিমাত্র চিঠি উদ্ধৃত করা হল--যার মধ্যে একদিকে নাগরিক হিসেবে নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ অপরদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্মানকে অগ্রাহ্য করার মত অসৌজন্য তাঁকে ব্যথা দিয়েছে।

Dr. Md. Shahidullah
M. A., B. L. (Cal) ; Dip. Phon. D. Litt. (Paris)

Phone : 5849
PIYARA HOUSE
79, Begum Bazar Rd.
Dacca—1
September 22, 1962

To
The Secretary,
Education Department,
East Pakistan Secretariate.
Dacca.

Dear Sir,

With reference to your D. O. No. 407(2) Edu., dated 6. 8. 62 and the subsequent reminder by the Section Officer by his office No. 497-Edu., S.VII/10M-21/62 dated 19. 9. 62. I beg to state that as a loyal citizen of Pakistan, I feel it my duty to follow the wishes

of my government. But at the same time I am unwilling to do anything which may cost a reflexion on the good name of my Government. I accepted the Fellowship of the Indian Council for Cultural Relations in good faith, finding nothing in its constitution objectionable from the point of view of a Pakistani and in the list of names of the fellows from outside India such as—

1. Earl C. R. Attlee (United Kingdom)
2. Prof. W. Norman Brown (U. S. A.)
3. Prof. D. H. Von Glassenopp (W. Germany)
4. Dr. Ali A. Hekmat (Iran)
5. Dr. Taha Hussain (U. A. R.)
6. Dr. G. P. Malayasekhara (Ceylon)
7. Prof. Louis Renon (France)
8. Dr. D. T. Suzuki (Japan)
9. Dr. Arnold J. Toynbee (U. K.)
10. Prof. Dr. Guissep Tucci (Italy)

I felt that if I stated the reason of my non-acceptance of the fellowship, that my Govt. regards the Indian Council for Cultural Relations as an instrument of propaganda, it will be a slur on my Govt. I had, therefore, personally consulted Mr. Qutratullah Shahab at Rawalpindi on the 30th of the last month for the considerate opinion of my Govt. on this point, showing him all the relevant papers. He promised to send the opinion of the Government to me. I am just waiting for his reply. In the meantime I request you to reconsider your opinion.

Thanking you,

Yours faithfully,
Shahidullah

পাকিস্তানের কাণ্ডকারখানা দেখে এবং নিজের চাকরীর নিরাপত্তার অভাব দেখে একদা ঢাকার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক পদের জন্য ১৯৪৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ঢাকায় তাঁর জীবনের তিন চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়েছে, স্ত্রীপুত্র পরিবার সেখানকার সমাজের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে তাকে ছেড়ে হুট করে চলে আসার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না। সুখের অন্বেষণে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন, ঢাকা

তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কিন্তু সব সময় মানসিক শান্তি দিতে পারেনি। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর জীবিকা নির্বাহের নির্দিষ্ট কোনো পথ ছিল না, কিছুকাল পল্লবের মত ভাসমান ছিলেন। অধ্যাপনা করে বিরাট সংসারের বোঝা বহন করেছেন, সাতপুত্র ও দুই কন্যাকে মানুষ করেছেন, বিয়ে-থা দিয়েছেন। তখনকার দিনে অধ্যাপকদের বেতন খুব কম ছিল। অবসরপ্রাপ্ত জীবনকে চালিয়ে নেবার জন্য তাঁকে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ পদের বেতন নিয়ে দর কষাকষি করতে হয়েছে। তিনি চেয়েছেন ৪৫০ টাকা। আর ৪০০ টাকা দেওয়াই কলেজের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের দরুণ তিনি ১৯৪৫ সালের ১৬ জুন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ ও আবেস্তার অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। ঐ আবেদন পত্রে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়েছিলেন--

> As regards my qualifications I beg to state that I passed the B. A. examination with Honours in Sanskrit of the Calcutta University with the Veda as one of the subjects in 1910 and the M. A. examination in comparative Philology in 1912 being the first student to pass in that subject from the Calcutta University. For my M. A. Degree I had to make a comparative study of the Vedic and Avesta languages. I obtained the Doctorate of the University of Pairs with the mention 'Tres Honourable' in 1928 and Diploma of the same University in Experimental Phoneties in the same year. I studied the Veda with Professor Jules Bloch of the University of Paris and Professor E. Leumann of the University of Freiburg in Germany, Comparative Philology with Professor A. Meillet of the University of Paris and also Avestan with him and old Persian with Professor Benveniste of the same University....
>
> I have acquaintance with a number of languages ancient and modern including Vedic, Avestan, Sanskrit, Old Persian, Tibetan, Arabic, Modern Persian, Hebrew, Urdu, Hindi, English, French and German. I have also an elementary knowledge of Pashto.

মোটামুটিভাবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা জানা গেলেও এর বাইরে কিছু কিছু ঘটনা আছে যার উল্লেখ নেই অথচ জানার দরকার আছে এই কারণে যে কত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। প্রথমে বলে রাখা ভাল তাঁর ছাত্রজীবন উজ্জ্বল নয়—গড়পড়তা সাধারণ পর্যায়ের ছাত্র হলেও জ্ঞানচর্চার দিক

দিয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ ছাত্র। তাঁর রচিত 'আমার সাহিত্যিক জীবন' প্রবন্ধটি প্রধানত তাঁর স্কুলজীবনের চিত্র হলেও ঐ প্রবন্ধ থেকেই তাঁর জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ও নিষ্ঠার কথা জানতে পারা যায়

ঃ স্কুলে ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল। আমি ঘরে বসে ফারসি উর্দু হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। এই স্কুল জীবনেই ভাষাশিক্ষা আমার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধুলো না করে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।

এই ভাষাশিক্ষার স্পৃহা পরবর্তীকালে হরিনাথ দে-র (১৮৭৭-১৯১৯) সংস্পর্শে এসে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯০৬ সালে এফ. এ. পাস করে হুগলি মহসীন কলেজে ইংরেজি ও সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজের অধ্যক্ষ হরিনাথ দে-র পরামর্শে কেবল সংস্কৃতে অনার্স রাখেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় নির্দিষ্ট বছরে পরীক্ষা দিতে পারেন নি আর বাড়িতেও আর্থিক টানাটানি চলছিল ফলে যশোহর জিলা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদ নিয়ে চলে গেলেন। শিক্ষকতা করতে-করতে পরীক্ষা দিলেন, এগ্রিগেটে এক নম্বর কম হওয়ায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। স্কুলজীবন থেকে হাফিয তার প্রিয় কবি ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস, চোখ বুজে দীওয়ান-ই হাফিযের পাতা খুললে যা বেরুবে তার অর্থ করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে কিনা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথও পারস্য ভ্রমণকালে হাফিযের সমাধির পাশে রক্ষিত দীওয়ান খুলে পরীক্ষা করেছিলেন। সাধক হাফিযের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য 'দীওয়ান-ই হাফিয' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় শহীদুল্লাহ্ নিজের ছাত্রজীবনের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ঘটনা উল্লেখ করেছেন তাতে এক ভদ্রলোকের জীবনবৃত্তান্তের কথা বলেছেন আসলে সেটি তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাই। তিনি বলেছেন, "আমি এক ভদ্রলোকের জীবনবৃত্তান্ত জানি। ১৯০৯ সালে তিনি যখন যশোহর জিলা স্কুল শিক্ষক ছিলেন, বি. এ পরীক্ষা দিয়া সমস্ত পরীক্ষণীয় বিষয় উত্তীর্ণ হইয়া কেবল ১ নম্বর এগ্রিগেটের জন্য ডিগ্রীলাভে বঞ্চিত হন। 'দীওয়ান' খুলিতেই নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধে দৃষ্টি পতিত হয় —

না উমীদ ম-শও আয্ দর-ই-রহ্মত আয় বাদাঃ পরস্ত' অর্থাৎ মদপুজারী! দয়ার দোরে, বসিস নে তুই ক্ষুন্ন মনে। ইহার পর বৎসর তিনি অনার্স সহ বি. এ পাশ করেন। তৎপরে আরও ছয়টি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ; ইহাদের কোনটিতেও তিনি বিফল হন নাই।" (১।৷/. ১৯৫৯) শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে সিটি কলেজে পুনরায় ভর্তি হন। ১৯১০ সালে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বছরের ১০ অক্টোবরে মরগুবা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও

আইন একই সঙ্গে পড়া শুরু করেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১) মুসলমান ছাত্রকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধও তিনি সেদিন রাখেন নি। ফলে এই নিয়ে তৎকালে এক আন্দোলন শুরু হয় এমন কি বিষয়টি বাঙলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। 'সঞ্জীবনী' 'নায়ক' 'হিতবাদী' 'The Bengalee' 'Comrade' প্রভৃতি পত্রিকায় বিষয়টি উল্লিখিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) মওলানা মহম্মদ আলীপ্রমুখ এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্রসমাজে তিনি এই বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। সংস্কৃতে এম. এ পড়া তাঁর হয়নি। আশুতোষের অনুরোধে ও হরিনাথ দে-র পরামর্শে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ পড়া শুরু করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই ছিল। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই বিভাগের প্রথম ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর পড়ার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভাগটি তাড়াতাড়ি খুলতে হয়েছিল। ১৯১২ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ পাশ করেন এবং ১৯১৪ সালে আইন পাশ করেন। ভাষাতত্ত্বে পড়ার সময়েই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় পরে এক গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। বসিরহাটে ওকালতি করতে করতেই ভাষাতত্ত্বের ওপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আশুতোষ ও সুনীতিকুমারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। পরিষৎ পত্রিকার ১৩২৪ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় সুনীতিকুমারের 'আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের একটি লিখিত সমালোচনা শহীদুল্লাহ্ সাহেব পরিষৎ কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। সুনীতিকুমার তখন পরিষৎ পত্রিকার পরিচালনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সমালোচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে-চিঠি হল এই

Council of Post-graduate
Teaching in Arts
Senate House

সবিনয় নিবেদন, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য হিসাবে আপনার আরবী ও ফরাসী লিপ্যন্তর সমালোচনা প্রবন্ধটি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। আপনি আমার সামান্য প্রবন্ধ লইয়া যে গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ পত্রিকায় যত শীঘ্র সম্ভব আপনার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। আপনি আপনার সমালোচনা পরিষদের জন্য পাঠাইয়া বিশেষ হৃদ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

আপনার সমালোচনায় আপনি যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার মত যেখানে আপনার মতের সহিত মিলে না সেই সম্বন্ধে বিশদ করিয়া লিখিয়া আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। 'উষ্ম' 'সংবৃত' প্রভৃতি শব্দ আমি যে সংজ্ঞায় ব্যবহার করিয়াছি, আরবীর, 'ছে' 'জাল' প্রভৃতির জন্য 'থ' 'য' কেন ব্যবহার করিতে চাই এই

সকল বিষয় যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আরও আলোচনা হইয়া শেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে একটা ঠিক হইলেই ভালো হয়।
বাঙ্গালা ছাপার সঙ্গে হিব্রু ছাপান বড় কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইবে। এক ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ভিন্ন অন্য কোনও ছাপাখানায় হিব্রু টাইপ পাওয়া যায় না। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের চার্জ বড় বেশী, পরিষদের পক্ষে বড়ই বেশী। যদি রোমান অক্ষরে হিব্রু কথাগুলি লেখা হয়, কোনও আপত্তি হইবে কি? আমাদের পরিষদের নিজস্ব কতকগুলি টাইপ আছে যেমন S2 (=SH) এগুলি কাজে আসিবে।
'অনুলিখন' শব্দটি অতি সুন্দর হইয়াছে ইহার কাছে 'লিপ্যন্তর' বড়ই শ্রুতিকটু লাগিতেছে। রামেন্দ্রবাবু আপনার উদ্ভাবিত এই শব্দটির বড়ই প্রশংসা করিতেছিলেন। এই শব্দটি সাধারণ্যে গৃহীত হইবার কোন আপত্তি হইবে না আশা করি। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এমন সুন্দর শব্দটি যাহার অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলাম আপনি উপস্থাপিত করিলেন আপনাকে আমি তজ্জন্য অভিনন্দন করিতেছি।

আমি এখন এম. এ-র কাগজ লইয়া ব্যস্ত ২০ সেপ্টেম্বরের পূর্বে পরীক্ষার ব্যাপার শেষ করিতে পারিব না। একটু অবকাশ পাইলেই আপনার সমালোচনা সম্পর্কে আমার নিবেদন লিখিয়া ফেলিব। আপনার প্রবন্ধ ও আমার প্রবন্ধ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিষদের মাসিক অধিবেশনে (১৯১৮, ১৫ সেপ্টেম্বর) শহীদুল্লাহ্ সাহেব সমালোচনাটি পাঠ করেন এবং তাঁর সমালোচনা সুনীতিবাবুর বক্তব্যসহ (পৃ ১৬৭ – ১৮৬) ১৩২৫ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় (পৃ ১৪৭ ১৬৩) প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের আলাপ-আলোচনা তাঁদের মানসিক রসায়নের কাজ করেছে বলে সুনীতিবাবু জানিয়েছেন। উভয়েই রচিত পুস্তক উপহার দিয়েছেন এবং উভয়ের বইপত্রে পরস্পরের ঋণস্বীকার ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। ODBL গ্রন্থে সুনীতিকুমার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চর্যাপদের ওপর গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করেছেন, শহীদুল্লাহ্ সাহেবও 'বাংলা ভাষারইতিবৃত্ত' (১৯৫৯) গ্রন্থে সুনীতিকুমারের নিকট তাঁর ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন এবং ODBL প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (১৯২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য করেছিলেন। সামাজিক ক্রিয়া-কর্মেও তাঁরা উভয়েই উভয়কে নিমন্ত্রণ করতেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বড় ছেলে মুহম্মদ সাফিয়ুল্লাহর বিবাহে সুনীতিকুমার যেতে পারেন নি কিন্তু পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ আশীর্বাণী (২২. ১০. ১৯৪২) পাঠিয়েছিলেন যেটি শহীদুল্লাহ্ সাহেব লোকজনকে দেখিয়ে

সুনীতিকুমারের উদারতা, পাণ্ডিত্য ও বন্ধুত্বের প্রশংসা করতেন। আশীর্বাণীটি এই গ্রন্থের শেষের দিকে মুদ্রিত হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সংস্কৃত পাঠের ব্যবস্থা আশুতোষ করে দিতে পারেন নি তবে তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে বিদেশে সংস্কৃত পড়ার কোন সুযোগ থাকলে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার জার্মানীতে সংস্কৃত পড়ার এক বৃত্তি ঘোষণা করেন। আশুতোষ যথাসময়ে সুপারিশপত্র লিখেও দেন কিন্তু যথাযথ স্থানে ঘুষ না দেওয়ায় মেডিক্যাল রিপোর্ট তাঁর বিপক্ষে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করতে এসে দেখলেন যে বিদেশী ডিগ্রী না থাকলে চাকরীতে কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুবছরের ছুটি নিয়ে ১৯২৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর প্যারিস সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যান। প্যারিসে থাকাকালীন সুনীতিকুমার এবং আইন কলেজের সহপাঠী রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বহু চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিগুলির মধ্যে এপর্যন্ত সুনীতিবাবুর ফাইলে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একটি চিঠি পাওয়া গেছে। সুনীতিবাবু জীবিত-অবস্থায় এই চিঠির কপি আমাকে দিয়েছিলেন। আজ উভয়েই বিগত তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সুনীতিকুমারের লেখা চিঠি আগে দিয়েছি এখন শহীদুল্লাহ্ সাহেবের লেখা চিঠির কপি নীচে দেওয়া হল —

Hotel de France et d'Orient
36, rue des Ecoles, Paris (sc)
19.10.26

বন্ধুবরেষু,

নমস্কার। এখানে এসে প্রায়ই মনে করি আপনাকে একখানি পত্র লিখি। ভাবতে ভাবতে মেলের দিন এসে পড়ে। বাড়ীর চিঠি লিখতে লিখতে মেলের সময় হ'য়ে যায়। আর লেখা হয় না। একটু গোড়া থেকেই পত্তন করা যাক। ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসে সেই দিনই মাদ্রাজ মেলে রওনা হই। সব গুছিয়ে নিতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার আর সুযোগ হয়নি। ৭ই সেপ্টেম্বর কলম্বো পৌঁছিই। ৯ই সেপ্টেম্বর সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ। ২৪শে সেপ্টেম্বর টঁলোঁয় এসে কূল পেলাম। তারপর দিন প্যারিসে এসে হাজির। পথে কোন কষ্ট হয়নি। Sea sickness-এর ওষুধ সঙ্গে ছিল। তাতে সামলে গিছলুম। এখানে ছ'তলায় একটি ছোট কামরায় বাস করছি। ভাড়া ৩৫০ ফ্রাঙ্ক মাসিক। আজকাল exchange ১৬৮ ফ্রাঙ্ক = ১ পাউণ্ড। বেশ সস্তা দেখছি। বুঝে সুঝে চালাতে পারলে ১০ পাউণ্ডে বেশ চলে যেতে পারে। এটি একটি কদলীরাজ্য বিশেষ। তবে দাড়ি ও টুপির জোরে এ পর্যন্ত সামলে আছি। প্যারিসের ভারতীয় বন্ধুদের কেউ কেউ গান্ধর্ব বিধানে বেশ সুখে দিন গুজরান করছেন। আমি অবশ্য তাঁদের ঈর্ষা করি

না। চাচা আপন বাঁচা। কোন রকমে 'অক্ষত চর্মে' বাড়ীর ধন বাড়ী ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি। তবে এখন কলির সন্ধ্যে। আরও কত বাকি।

আসল পড়াশুনা এখন কিছুই আরম্ভ করিনি। ৪ঠা নভেম্বর থেকে session আরম্ভ হবে। ফরাসী পড়ছি। তবে ফরাসী শেখবার যা সোজা পথ, সে পথে থেকে প্রবৃত্তি হয় না। অভ্যাস নেই। কি করা যায়? পঞ্চ মকারের ত্রি-মকার বর্জিত হয়েই চলেছি। শেষ রক্ষাই রক্ষা।

কতক বই সঙ্গে এনেছি। আরও কতক বই এব দরকার আছে। J. Bloch সাহেবের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। তাঁর বোধ হয় নিজস্ব অনেক বই আছে; যা আমার কাজে আসতে পারে। আপনার বই খানার জন্য একেবারে উৎসুক হ'য়ে আছি। দয়া করে একখানা পাঠিয়ে দেবেন কি? অবশ্য পত্র পাঠ মাত্র। "বিলম্ব সহে না আর।"

আসবার সময় গোলমালের ভিতর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ভি. পি. ফিরে গিছল। বোধ হয় সংখ্যা পায়নি। একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে সাহিত্য পরিষদে গিয়ে আমাকে বরাবর পত্রিকা পাঠাতে বলবেন কি? কবি আলোয়াল সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ অনেকদিন ধরে পরিষদে পড়ে আছে। সেটা কি ছাপা হবে না? একটু জিজ্ঞাসা করবেন ত?

এখন এখানে দেশের পোষ মাসের মত শীত। কিন্তু তেমন তীক্ষ্ন নয়। তবে সামনে এদেশের শীতকাল বাকী আছে।

ভাল কথা যদি J Bloch সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকে (অবশ্য আছে বলেই মনে হয়) তবে দয়া করে তাঁর কাছে আমার একটু তারীফ ক'রে (অবশ্য অসঙ্গতভাবে নয়) একখানি পত্র দিলে বোধ হয় আমার অনেকটা সুবিধা হবে।

ভাল আছি। আশা করি মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়ে এই প্রবাসী বিরহীজনের একটু খবর নিতে ভুলবেন না। ইতি

প্রীতিবদ্ধ
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
20 10.26

পুনশ্চঃ Calcutta University Press এর ঘটক মহাশয়ের কছে খোঁজ নেবেন আমার A Brief History of the Bengali Langnage এর শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াল। মেহেরবানি ক'রে আশা করি এ কষ্টটা স্বীকার করবেন। ইতি

মু. শ.

'কদলী রাজ্য' অর্থ প্রমীলা রাজ্য সুনীতিবাবু বলেছিলেন। যে বইটি শহীদুল্লাহ্ সাহেব পাঠাবার কথা বলেছেন সেটা হল ODBL, আলোয়াল সম্পর্কে যে প্রবন্ধটির কথা বলেছেন সেটি পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৩ বর্ষের ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত

হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় ফিরে এসেও তাঁর পদোন্নতি বহুকাল হয়নি। ১৯৩৭ সালে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ পৃথক করে দেওয়ার পর তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে (১৯৫০) পুনরায় বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ যুক্ত করে একটি বিভাগে পরিণত করা হয়, তিনি পুনবায় এর সহিত যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকালের একটি দফাওয়ারী বিবরণ দেওয়া হল -

অধ্যাপনা

১৯২১-২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের লেকচারার।
১৯২২-২৪ আইন বিভাগে খণ্ডকাল লেকচারার।
১৯২৬-২৮ বিদেশে অধ্যয়নের জন্য অবস্থান।
১৯২৮-৩৪ লেকচারার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।
১৯৩৪-৩৫ অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও রীডার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।
১৯৩৫-৩৭ অধ্যাপক (প্রফেসর) সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।
১৯৩৭-৪৪ অধ্যক্ষ ও রীডার বাংলা বিভাগ (অবসর গ্রহণ ৩০ জুন ১৯৪৪)।
১৯৪৮-৫২ অতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।
১৯৫২-৫৪ অধ্যক্ষ ও প্রফেসর, বাংলা বিভাগ (অবসর গ্রহণ ১৫ ১১ ১৯৫৪)
১৯৫৩-৫৫ ফরাসী ভাষার খণ্ডকাল অধ্যাপক (International Relation Dept-এ ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন লেকচারার ১৯৫৫, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)।
১৯৬৭, ১ এপ্রিল এমিরিটাস অধ্যাপক (আজীবন)।

অন্যান্য পদ

১৯২২-২৬ হাউস টিউটর সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল।
১৯২৮-৪০ ঐ হলের অস্থায়ী প্রভোস্ট (১৯৩২-৩৩, ১৯৩৭)।
১৯৪০-৪৪ প্রভোস্ট, ফজলুল হক মুসলিম হল।
১২. ১০. ১৯৬৩ আজীবন সদস্য ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়ন।
১৯২২-২৪ সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস' এবং 'ল' (নির্বাচিত বা মনোনীত)।
১৯২৮-৩৬ ⎫ সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস।
১৯৩৭-৪৪ ⎬
১৯৫২-৫৩ ⎭ (নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকার বলে)।
১৯৫৩-৫৪ ডীন, ফ্যাকালটি অফ আর্টস।
১৯২১-২৪, ১৯৩০-৪৪, ১৯৫২-৫৪, ১৯৬৩ সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল (নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকার বলে)।
১৯৩০, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৪, ১৯৪০-৪৪, ১৯৫৪ সদস্য, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকার বলে)॥

১৯৩০-৩৩, ১৯৩৭-৪৪, ১৯৫১-৫৪, ১৯৫৭-৫৮ সদস্য, য়ুনিভার্সিটি কোর্ট (মনোনীত বা পদাধিকার বলে)।

১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর চাব বছর তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হন তাঁর চেষ্টায় কলেজটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ও ডীন অফ ফ্যাকালটি অফ আর্টস নিযুক্ত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছব কাটাবার পর এক বছরের জন্য করাচিতে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে উর্দু অভিধানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির বিভিন্ন প্রকল্পেব সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বাংলা একাডেমিতে মাসিক ১৩২০ টাকা সম্মানী পেতেন। এরপর মাসিক পাঁচশত টাকা সৌজন্যমূলক ভাতায ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক যাবজ্জীবনের জন্য নিযুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বি. এ. ক্লাশের ছাত্রকালীন স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সম্পাদিকার মন্তব্যসহ তাঁর রচনা 'মদনভস্ম' প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩২৭ বৈশাখে 'আঙ্গুর' নামে ছোটদের একটি মাসিক কাগজ বের করেন ঐ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'ভারতের সাধারণ ভাষা' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটি 'মোসলেম ভারত' বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সভার বিবরণ ঐ পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৭ সংখ্যায় হেমন্তকুমার সরকার লেখেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে সভায় ড. তারাপুরওয়ালা পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধটি সম্পর্কে "রবীন্দ্রনাথ বলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থলে সাধারণ ভাষা যে ইংরেজি হইবে ইহা এক প্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও এতদিন ইংরেজি চলিতেছিল কিন্তু এখন একটা কথা উঠিয়াছে ভারতীয় কোন ভাষা চালাইতে পারা যায় কিনা এবং এই উপলক্ষে হিন্দীর নাম উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কথা ধরিলে তিনি ইংরেজি অপেক্ষা হিন্দীতে যে কোনও সুবিধা হইবে তাহা তিনি মনে করেন না।" ১৯২১ সালে পুজোর বন্ধে নজরুলকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, ১৯২৩ সালের পৌষ উৎসবে, ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। তাঁর ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১) গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভাষাতাত্ত্বিকরূপে তাঁব কৃতিত্বকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর প্রতি তিনি এত প্রীত হয়েছিলেন যে বিশ্বভারতীর প্রথম ম্যানেজিং কমিটিতে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে নিয়েছিলেন। মুর্তজা বশীরের মতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি নাকি পিতার চিঠির খসড়া দেখেছিলেন। ড. আনিসুজ্জামানও তাঁর কথাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের জন্য যে দরখাস্ত ১৮ই জুন ১৯৪৫ সালে করেছিলেন

তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রেরও যোগাযোগ ছিল—তাঁকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি গ্রন্থ শেষে দেওয়া হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন, 'গীতাঞ্জলি' তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা না একটা বই পড়াতেন। তাঁর সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেব গোটা আটেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের অবদান নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের ডাক দেয় শহীদুল্লাহ্ ঐ ডাকে সামিল হতে পারেন নি। রবীন্দ্র সাহিত্য প্রধানত হিন্দু সাহিত্য পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকারক এই প্রচার সরকার কর্তৃক শুরু হয়। বেতার দূরদর্শনে তাঁর সাহিত্যের প্রচার বন্ধ করা হয়। তখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব পাকিস্তানের ঐতিহ্য গঠনে রবীন্দ্রনাথ যে অপরিহার্য, তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য থাকে না, ইসলামের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কোন বিরোধ নেই তা তিনি জোর গলায় বলেছেন। 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মুসলমানদের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে গ্রহণযোগ্য তা বলতে গিয়ে বলেছেন, "বিশ্বনবী (সঃ) বলেছেন কলিমতুল্ হিক্‌মতি দাল্লাতুল হকীমি হয়সু ওজদহা ফহুওআ আহক্কু বিহা জ্ঞানের বাক্য জ্ঞানীর হারানো ধন, যেখানেই কেউ তাকে পাবে, সেই তার হকদার হবে। আমরা পাকিস্তানীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চ ভাবধারাকেও আমাদেরই জিনিষ বলে দাবী করতে পারি।..পাক ভারতের এই মনীষীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব এবং তাঁর সত্যবাণীকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব।"

ঢাকায় চলে গেলেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। কলকাতায় থাকার সময় মাসিক সাহিত্য অধিবেশনে তিনি একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, পরিষৎ পত্রিকায় তাঁর ২২টি প্রবন্ধ ১৩২৫-১৩৬৭-র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সাহিত্য পরিষদের বিদায়ী সভাপতির ভাষণে (৩২ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পরিষদের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন) পরিষদের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্র সম্পর্কের কথা এবং চর্যাপদ আলোচনায় তাঁর দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "শ্রীমান্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহুকাল কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন তথাপি সাহিত্য পরিষৎকে ভুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রবন্ধ দিতেছেন। তিনি সাহিত্যপরিষদের বৌদ্ধ গান ও দোহা নামক পুস্তক হইতে দুইখানি দোহাকোষ ফরাসিভাষায় তর্জমা করিয়া খুব নাম করিয়াছেন। তিনি ঐ দুইখানি দোহাকোষ ভোট ভাষার তর্জমার সহিত মিলাইয়া উহার যে সকল অপূর্ণ অংশ ছিল তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধগান ও দোহার দুইটি পাতা ছিল না, ভোট তর্জমা হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহার ভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৭ ২য় সংখ্যা, পৃ ৬৫-৬৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে তদানীন্তন সহকারী সভাপতি সজনীকান্ত দাস ১৯৫০ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র চর্যাপদাংশ সম্পাদনার ভার তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ

করেছিলেন কিন্তু তাঁর পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় নি, সদ্য দেশ বিভাগের ডামাডোলে তিনি নিজেই তখন অস্থির। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভাষানীতির সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি বলে তাঁকে তখন 'দেশের শত্রু' 'ভারতীয় চর' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করলে আবার এক ফ্যাসাদ বাড়বে বিরোধীরা মওকা পাবে। প্রধানত এই কারণে তিনি পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

দেশভাগের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুকরণে বাংলা একাডেমি গড়ার প্রস্তাব তিনি প্রথম দেন ১৯৪৮ সালে। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি গঠিত হয় এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে উন্নয়ন বোর্ড একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। বাংলা একাডেমির তিনি জীবন সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে একাডেমির উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ও ১৯৬১ সালে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। উপরোক্ত কাজ শেষ হতে না হতেই 'বাংলা পঞ্জিকা তারিখ নির্ধারক কমিটি'র সভাপতি তাঁকে করা হয় (১৯৬৩-৬৫)। একাডেমি পত্রিকায় ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৯ মধ্যে তাঁর নটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং একাডেমি আয়োজিত সভায় তিনি বহুবার অংশ গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর একাডেমির দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। তাঁর আশিবছর পূর্তি উপলক্ষে একাডেমি তাঁকে সম্বর্ধনা জানান (৯ই শ্রবাণ ১৩৭২)। অভিনন্দন পত্রে তাঁর সম্পর্কে বলা হয় "উদ্দীপ্ত ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুসরণ চিরদিন আপনার লক্ষ্য ছিল। আপনার জীবনে তা' যেমন অনুসৃত হ'য়েছে অন্যের জীবনেও তা' সংক্রামিত হয়েছে। আপনার ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুশীলতা চিরকাল মানুষের অবলম্বন হোক্ এই আমাদের প্রার্থনা। যথার্থ জ্ঞান যে মানুষকে স্পর্ধিত করে না, বিনয়ী করে, আপনি তার দৃষ্টান্তস্থল। অনবরত অনুসন্ধিৎসায় আপনার চিত্ত সকল মুহূর্তেই সচল এবং আনন্দিত। আপনার সাহচর্য লাভ করে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।"

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জন্ম হয়েছিল ধর্মীয় পরিবারে। তাঁরা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের বংশানুক্রমে সেবাইত অর্থাৎ খাদেম। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় বাতাবরণে তাঁর জীবন প্রথম থেকেই লালিত হয়েছে। পাঠশালায় প্রবেশের আগে বাড়ীতে আরবীতে হাতে খড়ি হয়েছিল, আরবী ফারসি পাঠ তাঁর শৈশবে শুরু হয়। নমায রোযা ইত্যাদি শরীয়তি বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন, শতকর্মের মধ্যে থেকেও সময়মত নমায আদায় করতেন—তাঁর ব্যাগের মধ্যে জায়নমায ও কম্পাস থাকত। রোযা ভেঙে কোন পার্থিব সুযোগ গ্রহণ করতে তাঁর বিবেকে বেধেছে, এজন্যে প্রথম বিদেশ যাত্রার সুযোগও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ১৯৫৫ আগস্ট মাসে হজ সমাপন করেছিলেন—হজের দো'আ দরূদ নিয়ে একটি ছোট পকেটবুক হজ যাত্রীদের

জন্য রচনা করেছিলেন (১৯৫৭)। দো'আ দরূদ একজায়গায় সংকলিত এমন বইয়ের অভাব ছিল। হজের কোন্-কোন্ স্থানে কী-কী দো'আ দরূদ পাঠ করতে হয় মূলের সঙ্গে বাংলায় উচ্চারণ, তর্জমা ও প্রসঙ্গ কথা বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন যাতে কোনো যাত্রীর বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয়। 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন, "কিতাবে যে সমস্ত লম্ব। লম্বা দো'আ দরূদ দেখিয়া পড়িতে পড়িতে হয়রান হইয়া গিয়াছি, পরে সন্ধান করিয়া দেখিলাম তাহাদের অধিকাংশের কোনও আসল নাই। এই পুস্তিকায় যে দো'আ দরূদ দিয়াছি, তাহার প্রায় সমস্ত হিসনুল হসীন ও সৌদী সরকারের প্রচারিত পুস্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছি ; দু'একটি দো'আ দরূদ অন্য প্রামাণ্য কিতাব হইতে লইয়াছি। আশা করি যাঁহারা হজ্জের ও মদীনার রওযা পাকের যিয়ারত ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই ছোট বইখানির দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবেন।" হুগলী জেলার ফুরফুরার পীর হযরত মৌলানা শাহ্ সূফী মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী তাঁকে মুরীদ অর্থাৎ শিষ্য করার অনুমতিও দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব মুরীদ করার ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও কাউকে তিনি মুরীদ করেন নি বরং ঐ বিষয়ে তাঁর অনীহা ছিল। ধর্মীয় নেতা বা পীর বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনো কালে ছিলেন না। শিষ্য পরিবৃত হয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন তিনি যা অন্যান্য পীররা করে থাকেন। 'আল্লাহতা' লাব গুণাহগার বান্দা'রূপে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন—নামের আগে বা পিছনে 'মুজদ্দদী' বা 'শাহকুতুব দস্তগীর' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন অতিভক্তিবশত কেউ যদি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করত তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, প্রকাশ্যে বকা-ঝকা করতেন। নাচ গান বাজনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না নিজের কনিষ্ঠ পুত্র মুর্তজা বশীরের শিল্পী হবার পিছনে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি তাঁকে আর্ট কলেজে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সংসার খরচে তিনি শিল্পীপুত্রের ছবি বিক্রীর টাকা কখনও গ্রহণ করেননি। ওটা হারাম বলে মনে করতেন। মুর্তজা বশীর তাঁর পিতার মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তাঁর ধর্মনিষ্ঠার কথা বলেছেন, "বাবু আমাকে হাফেজ করতে চেয়েছিলেন।······কিন্তু আমি চাইতাম আর্টিষ্ট হতে। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর আমার আর্ট কলেজে ভর্তি হবার বাসনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না তিনি।···আমি আমার মতে অটল থাকলাম।··ধর্মীয় বিধানের বাইরে কোন কিছু করতে তিনি মনে প্রাণে পারতেন না।···একদিন ডাকলেন। জিগগেস করলেন তাহলে কি ঠিক করলে? আমি আমার মতামত জানালাম।···কিছুক্ষণ চুপ করে বললেন, বেশ। সিনারী এঁকো। আমার হাতে টাকা তুলে দিলেন।···ইতালীতে দু'বছর পড়ার জন্য খরচ দিয়েছিলেন তিনি, অনেকে তাঁকে এজন্য অনেক কথাই বলেছে। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিতেও কার্পণ্য করেনি। বিদেশ থেকে আমি ফিরে আসার পর তিনি এ-সব আমাকে জানিয়েছিলেন।···শুধু বলেছিলেন, তোমার ভরণপোষণের জন্য আমি খরচ বহন করেছি।" (আমার বাবা ও আমি: দৈনিক পাকিস্তান) ১৯২৩ সালে

'আঞ্জুমান-ই-ইশা আৎ-ই ইসলাম' নামে এক সমিতি গঠন করেছিলেন। রাজস্থানের অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর মালকানা মুসলমানদের আর্য সমাজ সে-সময় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করছিলেন। এই শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলামের মাহাত্ম্য তিনি প্রচার করেছিলেন। ওকালতি করার আগে একবার মিশনারি হয়ে যেতে চেয়েছিলেন—সাংসারিক অভাবের জন্য হতে পারেননি। ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য তাঁর বিশ্বাস খুব গভীরে প্রোথিত ছিল ফলে তাঁকে অনেকেই হয়তো রক্ষণশীল ধর্মান্ধ ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে পারেন। 'ইসলাম' বলতে তিনি কী বোঝেন, প্রকৃত ধর্ম কী তা বুঝতে পারলে মনে হবে আজকের দিনে স্বধর্মে থেকেও তাঁর মত প্রগতিশীল ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। তিনি একখানি চিঠিতে ইসলামের ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ঃ যা আল্লাহ্‌র জিনিস তা' সকলের হিতের জন্য। আল্লাহ্‌র আলো, আল্লাহ্‌র বাতাস, আল্লাহ্‌র পানি তা' সকলের জন্য। যে আল্লাহ্‌র জিনিসকে একচেটিয়া করিতে চায়, সে-ই 'জালেম' (অত্যাচারী)। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ যেমন তোমার মঙ্গল করিয়াছেন, তেমন তুমি (সকলের) মঙ্গল কর।" আল্লাহ্‌র মঙ্গলে যেমন কারোও ভেদ নাই, যে মুসলমান তারও মঙ্গলে কারোও ভেদ থাকিতে পারেনা। এই মঙ্গল সাধনে মানুষই নয়, সমস্ত জীবজন্তু, এমনকি গাছ-পালাটি পর্যন্ত কেহই বাদ যাইবে না। এই হইল ইস্‌লামের আদর্শ।...

আজকাল আমাদের মধ্যে যারা বেশী ধার্মিক তাঁদের সময় যায় নফল রোযা রেখে ও তছবীহতে। এ সব ইবাদত। কিন্তু ইহা স্বার্থপর ইবাদত। বিশ্বের সেবা তার চেয়ে খুব বড় ইবাদত। একথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

অনেকদিন পরে এখন ধুম পড়িয়া গিয়াছে ধর্ম প্রচারের, চারিদিকে দেখিতেছি কত 'তবলীগ' সমিতি, কত ইশাআ'তে ইসলাম সমিতি। খালি কথা, কথা, কথা, কথায় জগৎ ভুলে না। জগৎ কাজ চায়। মরিবার পর স্বর্গের অনন্ত সুখের আশায় মানুষ পৃথিবীর নিত্য নরক যন্ত্রণা ভুগিতে পারে না। ইসলাম প্রচার করিতে হইলে মানুষকে দুনিয়াতে বেহেস্তের আস্বাদ দেওয়াইতে হইবে। চারিদিকে ক্ষুধার্তের হাহাকার, পীড়িতের চিৎকার, দরিদ্রের ক্রন্দন ও উৎপীড়িতের আর্তনাদ। এখানেই 'হাভিয়া দোজখ্'। যে এই 'দোজখ্' নিবাইতে পারে সে-ই প্রকৃত ইসলাম প্রচার করে। (একখানি পত্র ঃ ইসলাম প্রসঙ্গ পৃ ২৬৬-৬৭, ১৯৭০)।

ধর্মের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে মানুষের শুভচেতনাকে জাগ্রত করানোই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, স্বধর্মে থেকে মহৎভাবনায় উদার চিন্তায় সকলের অন্তর্লোক আলোকিত হয়ে উঠুক এই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকের পাঠ্যপুস্তক কমিটির সভায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর একটি অংশের প্রশংসা করেছিলেন এবং পাঠ্যপুস্তকে সেটি রাখার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ঐ সভায় কবি গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং ঠাকুর দেবতার প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ্যপুস্তকে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত ধার্মিক ব্যক্তি সুপারিশ করেন তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তদুত্তরে বলেছিলেন ধর্মকে নিয়ে তিনি ব্যবসা করেন না, তিনি একজন বিশ্বাসী মুসলমান। বিশ্বাসী মুসলমান যখন নিজের ধর্মকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে তখন সে আর অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে না, শ্রদ্ধা করে। হযরত মুহম্মদের (দঃ) সেই বাণী 'আল ইনসান আখুল ইনসান' প্রতিটি মানুষ প্রতি মানুষের ভাই, কুরআনে আছে 'কানান্নাসো উম্মাতন্ ওয়াহেদাৎ' সমগ্র মানবমণ্ডলী একজাতি --এই মিলনসূত্রে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে এক মোহনায় মিলিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল তাঁর। সেজন্যে মিলাদ ওয়াজ মহফিলে যেমন যেতেন তেমনি বৌদ্ধমঠ ব্রাহ্মসমাজ রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত ধর্মসভাতেও বক্তৃতা দিতেন। ৪৬-এর দাঙ্গার সময় দেশে বাড়িতে ঈদ উদযাপনের জন্য এসেছিলেন তখন চারিদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। বসিরহাটেও গোলমালের সূচনা হয়। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে উভয় ধর্মের ওপর এমন এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার ফলে দাঙ্গা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে যখন পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা শুরু হয় তখন তাঁর সভাপতিত্বে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' গঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে সেদিন তিনি আবেদন করেছিলেন। নিজস্ব ধর্মে নিবেদিত প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মকে অমানবিক কার্যে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি' প্রবন্ধে বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান নামে দুই মহান জাতি ভারতবর্ষে বসবাস করিবে ইহা বিধাতার ইচ্ছা। ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়বন্ধনে সম্বন্ধ হইয়া নিরূপিত মহান উদ্দেশ্যসমূহ পৃথিবীতে সুসিদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পরস্পর সদ্ভাব বিদ্যমান থাকা অতীব প্রয়োজন।" এই সদ্ভাব যাতে নষ্ট না হয় সারাজীবন তিনি চেষ্টা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবাজী উৎসবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঔরঙ্গজেব উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত মুসলমান ছাত্ররা গ্রহণ করে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই জাতীয় উৎসবের বিরোধিতা করেছেন ফলে উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। যেখানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন সেখানে ঐ জাতীয় উৎসব ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াতে সাহায্য করে, বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে। তাঁর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশবাসীর তরফ থেকে যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয় সেই মানপত্রে তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা করা হয় "হে নিরহঙ্কারী শান্তির দূত! তুমি চাহিয়াছে যে, মানুষ স্বীয় অন্তর হইতে দ্বেষ-বিদ্বেষের গ্লানি দূর করিয়া খোদার প্রকৃত 'আশরাফুল মখলুকাৎ'-রূপে জীবনযাপন করুক। সেই তাগিদে তুমি বিভ্রান্ত জনতার মাঝে নির্ভীক চিত্তে আগাইয়া ধীর ও শান্ত সুরে শুনাইয়াছ শান্তির বাণী।

তোমার সেই শান্তির বাণীতে মুগ্ধ হইয়া বিবদমানেরা ভুলিয়া গিয়াছে নিজেদের দ্বন্দ্ব-কলহ-বিদ্বেষ !" (২রা আগস্ট ১৯৫৮) প্রগাঢ় ধর্মবোধ থেকেই তাঁর মধ্যে একটি পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে উঠেছিল। স্বধর্মে সুস্থির থেকে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে তাঁর নিজের কোন অসুবিধে হয় নি বরং জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে যেমন গৃহীত হয়েছেন তেমনি সকলকে নিজের কাছে টেনে এনেছেন। নয়ন মেলে নিখিলে যা কিছু পেয়েছেন তার মধ্যে তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরের প্রকাশই দেখতে পেয়েছেন।

দেশের প্রতিটি আন্দোলন ও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করেননি বরং জনতার মধ্যেই নিজের স্থান খুঁজে নিতে চেয়েছেন। পাড়া প্রতিবেশীর আনন্দ-বেদনায় শরিকদার হয়েছেন। ঢাকার যে স্থানে তাঁর বাড়ী ছিল তার চারপাশে ছিল গরিব লোকের বাস। ভাল-মন্দ রান্না হলে তাদের জন্য কিছু রেখে দেবার নির্দেশ ছিল তাঁর। সকাল সন্ধ্যা মসজিদে নমায পড়ার পথে গরীব ছেলেমেয়েদের মিঠাই লজেন্স বিস্কুট যা যেদিন থাকত তাই বিতরণ করতেন। গরিব মানুষরা যখন যে-কাজে তাঁকে ডেকেছে নিজের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন—তাদের বিচার-সালিশী করে দিয়েছেন। তাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আর্থিক সাহায্য সহায়তা করতেনই উপরন্তু তারা যদি খাবার নিমন্ত্রণ করত তিনি খুশী মনে তৃপ্তির সঙ্গে তাদের সঙ্গে ভোজন করতেন। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিল না বলে তাঁকে সবাই নিজের লোক বলে মনে করত। ঢাকার কুট্টি সমাজে তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প আছে। কুট্টিরা তাঁকে বলত 'এলমের জাহাজ' 'লবজের ডাগদার'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলত 'বড় মাদ্রাসা' তার শিক্ষক শহীদুল্লাহ্‌কে বলত 'বড় মৌলবী সাব' আর তাঁর মোটর গাড়ীকে বলত 'মুরগী মারা গাড়ী' -একবার তাঁরা মোটরে কুট্টিদের একটি মুরগী চাপা পড়েছিল। শহীদুল্লাহ্‌ সহজ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন—ধীমান হলেও বাস্তববুদ্ধিতে তেমন চৌকস ছিলেন না। তাঁর থেকে কম মেধাশক্তি সম্পন্ন লোকেরা কী চাকরীর ক্ষেত্রে কী সামাজিকতায় তাঁর থেকে অনেক বেশী গুছিয়ে নিয়েছেন। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের এই খামতির দিক নিয়ে কুট্টিরা রসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে। যেমন একবার বঙ্গীয় আইন পরিষদের (Bengali Legislative Assembly) নির্বাচনে কাল্লু মিয়া অর্থাৎ সৈয়দ সাহেব আলম দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর বিপক্ষে ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীনের ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব কাল্লু মিয়ার তরফে ছিলেন। নির্বাচনে সাহাবুদ্দীন জয়ী হন। কুট্টিরা এই বিষয়কে নিয়ে এক ছড়া তৈরী করে—বিদ্যা আছে বুদ্ধি নাই শহীদুল্লাহ্‌ সাব / বুদ্ধি আছে বিদ্যা নাই শাহাবুদ্দী সাব / বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাই কাল্লু মিয়া সাব।

ঢাকায় যখন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তারুণ্যের উন্মাদনায় আন্দোলনের নেতারা অনেক ক্ষেত্রে

ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার জন্য ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করেছেন, জনতা ক্ষিপ্ত হয়েছে, সালিশী করেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ঈদের নমাযে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না বলে ঢাকার উন্মুক্তস্থানে তাঁরা পৃথকভাবে ঈদের নমায পড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগ ধর্মবিরোধী বলে মৌলবাদীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন এবং পণ্ড করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যান। শহীদুল্লাহ্ সাহেব মহিলাদের শুধু সমর্থনই করেন নি ঐ নমাযে তিনি ইমামতীও করেছিলেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে কুরআন ও হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর কার্যধারার মধ্যে মহিলাদের এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। 'ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কুরআন ও হযরত মুহম্মদ (দঃ) নমাযে নারীর শরিক হবার অধিকার মেনে নিয়েছেন। তিনি উদাহরণ সহযোগে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, "হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) কলেমা, নমায, যকাত হজ্জ ও রোজাকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (আরকান) বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটিতে নরনারীর সমান অধিকার তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। হজ্জের সময় যখন লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্যে নারীরা অনাবৃত মুখে হজ্জব্রত সম্পাদন করে, তখন হজরতের সাম্যবাদের শিক্ষা জাজ্জল্যমানরূপে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।" নারীর পর্দাপ্রথা তিনি স্বীকার করেন নি। তাকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার বিরুদ্ধে তিনি, তাবলে পোষাক-পরিচ্ছদের উচ্ছৃংখলতাও সমর্থন করেননি। তাঁর মতে "পর্দা দুরকম একরকম ইসলামী পর্দা, সে হচ্ছে মুখ হাত পা ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অন্‌ইসলামী পর্দা সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্য কয়েদ ক'রে রাখা। ইসলামী পর্দায় বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরুন কি অন্যের সঙ্গে দরকারি কথাবার্তা মানা নয়; অন্‌ইসলামী পর্দায় এসব হ'বার জোটি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এই অন্‌ইসলামী পর্দা ফাঁক করে দিতে। তা না হ'লে আমাদের নারী হত্যার মহাপাপ হবে।" (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ১৯২৮) বোরখার প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাব ছিল না কিন্তু মেয়েদের রুচিসম্মত সাজগোজ পছন্দ করতেন তীব্র আধুনিকতায় সাজসজ্জা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন -ক্লাসে কিংবা সভাসমিতিতে মাথায় কাপড় না দেওয়াটা বেআদবী বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন এলোকেশী সর্বনাশী। ক্লাসে বা সভাসমিতিতে মেয়েদের মাথায় কাপড় না থাকলে মাথায় কাপড় দিতে বলতেন। ইসলাম নির্দেশিত সীমানার মধ্যে তিনি ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

অপসংস্কৃতি ও অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে আমরা আজ যেভাবে সোচ্চার, দেশ ও জাতিকে সুকৌশলে যেভাবে অধঃপাতের দিকে ক্রমশঃ ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একদিন শহীদুল্লাহ্ সাহেব রুখে দাঁড়িয়েছেন। ঢাকায় 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যেমন জড়িত ছিলেন তেমনি ঢাকায় 'সুনীতি সঙ্ঘে'র সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তিনি

দেখেছেন তারুণ্যের নামে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের আবরণে যৌনবিকারের অশ্লীল চিত্র। সেজন্যে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন, "আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিষ বাজারে চলছে। শুনি তার খাঁকতিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের একটা অপূর্ব দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহমানে ও শয়তানে যে তফাৎ আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, প্রেমে ও কামে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেণের বাঁশীর সুরের ন্যায় এই অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত সৌর-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।...আমি অরসিক নই, আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ-ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারীফ করতে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই বলে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রীর লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে।" (মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ১৯২৬, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী)।

আজীবন তিনি মাতৃভাষার সেবা করেছেন, মাতৃভাষাতেই তিনি তাঁর চিন্তারাজী প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী মানপত্রে তাই উল্লেখ করেছিলেন, 'তুমি বহুভাষাবিদ হইয়াও লোকভাষী।...বহু ভাষাবিদ হইয়াও তুমি প্রথমত ও প্রধানত মাতৃভাষী।' (আগস্ট ১, ১৯৬৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ক্লাসে রোলকলের সময় ছাত্রদের কাছ থেকে বাংলাভাষায় প্রত্যুত্তর ভালবাসতেন। মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রদের মনের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বাংলা সমিতি তাঁকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন তাতে তারা তাঁর কাছে ঋণের কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, 'যে জ্ঞানের আলো দান করেছ, সে ঋণ অপরিশোধনীয়। গ্রহীতাদের চোখের তারাতে যে উজ্জ্বল অভিব্যক্তি সে তোমার দানেরই উজ্জ্বল ছায়া।' (আষাঢ় ৩০, ১৩৬৫) মাতৃভাষার সেবকদের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। বাংলা ভাষা ও জাতি হিসেবে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাঙলা আমার মাতৃভাষা, মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র।' (বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য়, মুখবন্ধ) তাই ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা ভোলার নয়।

পাকিস্তান হবার আগে থেকেই অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষা নিয়ে একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু হবে এই বিরোধ উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের ত্রিশ দশকের শেষেও চলেছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব প্রথম থেকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা হবে এবং

তাই হওয়া উচিত একথা তারস্বরে সভাসমিতিতে ভাষণে প্রবন্ধে নিবন্ধে বার বার বলেছেন। ১৩২৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন সেটি "আমাদের সমস্যা" (১৯৪৯) গ্রন্থে 'আমাদের ভাষা সমস্যা' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আমরা বঙ্গদেশী। আমাদের কথাবার্তার, ভালবাসার চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি।" শহীদুল্লাহ্ সাহেব দেখালেন যে প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি লৌকিক ভাষাও প্রচলিত ছিল। ঋষিরা লৌকিক ভাষাকে অপভাষা বা শ্লেচ্ছদের ভাষা বললেও শেষ পর্যন্ত পুজোর্চনা ছাড়া সংস্কৃত ভাষা লৌকিক ভাষার কাছে পরাজিত হয়। ভাষার অভিজাতরূপ বলে কিছু নেই। লৌকিক ভাষা জনতার ভাষা, জনতার সুখদুঃখ হাসি-কান্না ব্যক্ত করে। ভাষার এই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের মাতৃভাষা নয় কিংবা ইসলামি ভাষাও নয়, ধর্মীয় ভাষা নয়. মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভাষাও না। কারণ পাকিস্তানে পুস্তু, বেলুচি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে। মুসলমানদের মধ্যে যদি ঐক্য প্রতিষ্ঠর কথা বলা হয় তাহলে আরবী ভাষাই জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত কিন্তু আরবী বিদেশী ভাষা যদিও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আর ধর্মীয় ভাষা কখনই রাষ্ট্রভাষা হতে পারেনা -কোন দেশেই তা হয়নি। ইরাণ তুরস্কে লৌকিক ভাষায় কুরআনের তরজমা হয়েছে সেটিই পাঠ করা হয়। কাজেই তাঁর মতে পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষা বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা। তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। কত অধিকসংখ্যক লোকে একটি ভাষা বলে, এই অনুযায়ী বাংলা ভাষা বিশ্বভাষার মধ্যে সপ্তমস্থান অধিকার করিয়াছে। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।" (পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা : আমাদের সমস্যা) তিনি এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি প্রায় বিদ্রোহ করার মত ভাষায় তিনি গর্জে উঠেছিলেন, "বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।...আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।" (ঐ)

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা নিয়ে বিতর্ক কিছুদিন চুপচাপ ছিল পাকিস্তান

হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে সেই সম্প্রদায় যাঁরা উর্দুর ওকালতি করছিলেন তাঁরা এবার মওকা পেলেন। দেশভাগ হবার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। মাতৃভাষার প্রতি এই অবমাননা সেখানকার অধিবাসীরা শান্তচিত্তে মেনে নেননি। তাঁরা প্রবল বিরোধিতা ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মর্ম কথাটি শহীদুল্লাহ্ সাহেব ১৯৪৮, ৩১ ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নির্ভয় চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন --

ঃ আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয় ; এটি একটি বাস্তব ঘটনা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার যো'টি নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অণুবীক্ষণযন্ত্র চোখে ধরে হয়তো আবিষ্কার করতে পারে কার শরীরে দু'চার ফোঁটা বেশী বা কম আর্য আরব পাঠান বা মোগল রক্ত আছে।...

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর একদল চাচ্ছে জবাই করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।......

স্বাধীন পূর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে কেউবা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর তাদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞানের বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত, আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়। তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।

ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চেই ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়। 'আজাদ' 'সৈনিক' প্রভৃতি কাগজে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার তোড়ে এই ভাষণটি শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে (১৯৬৭) সন্নিবেশের সময় অনেক অংশ বাদ দেওয়া হয়। বাংলাকে যাতে রাষ্ট্রভাষা কোন রকমে না করা হয় সেজন্য সরকার প্রথম থেকেই নানা ধরণের চক্রান্ত করতে থাকে। তাদের ভয় ছিল যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে

যোগসূত্র রচিত হবে তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্ব বজায় থাকবে না। সেজন্য বাংলা ভাষাকে কাফেরের ভাষা বলে প্রচার করতে থাকে, বাঙালি জাতিকে বিদ্রূপের পাত্র করে তোলে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এর প্রতিবাদে সোজাসুজি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে কিন্তু ভাষাগত তো শত্রুতা নাই। যে বাংলা ভাষা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।" (সিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির ভাষণ ১৯৫৩) তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেন। তাঁর প্রস্তাব কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর কাছে রাখেন। সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ পরিকল্পনায় সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতামত নিতে পরামর্শ দেন। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মাহমুদ হাসানকে দিয়ে তার কাছে চিঠি পাঠান। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই অবাস্তব প্রস্তাবে কোন উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ করেননি তিনি তার বক্তব্য প্রেসের কাছে প্রকাশ করেন এবং সেটি কলকাতার আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত হয়। ফলে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৯, ১৪ই ডিসেম্বরে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের চা-চক্রে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে মাহমুদ হাসান সোজাসুজি দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজস্ব অভিমতে দৃঢ় থাকেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস আরবী হরফ প্রবর্তনের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এইজন্য যাহারা আরবী হরফের জন্য প্রস্তাব করিতেছেন তাঁহাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, এই বিতর্কবহুল বিষয়ে চেষ্টার অপচয় না করিয়া বরং অনতিবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে এবং দেশব্যাপী জনশিক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে যেন তাঁহারা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগকে সক্রিয় করেন। যাহারা ধর্মের দোহাই দিয়া পাকিস্তানকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে চির নিমগ্ন রাখিতে চাহেন, তাহারাই পাকিস্তানের দুশমন। ইহাই আমার বিশ্বাস।" (আরবী হরফে বাংলা ঃ আমাদের সমস্যা) তাঁকে দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত East Bengal Language Committee-র সদস্যপদও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপোষহীন মনোভাবের জন্য অপর ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) রাজশাহী থেকে ১৩ ৪. ১৯৪৯ তারিখে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন

> To day's (13. 4. 49) Statesman publishes a news of the 10th instant from Dacca that you have declined to serve on the Eight-man Committee recently formed by the Ministry of Education Pakistan to examine the Arabic script suitable for all regional languages on the ground that 'It wiil be highly unwise for literary

and political reasons to make any attempt to replace Bengali script in Arabic.'

I deem your decision a victory of intellectual courage and conviction over political pusillanimity and motivation of knowledge over ignorance, of science over riverine and of modern realism over medieval sentimentalism. I, therefore, hasten of congratulate you on the very wise decision, you have taken on the subject. May Allah give you sufficient mental strength to fight to the last for a cause so obviously misguided and misleading

পশ্চিমবঙ্গের লেখ্যভাষা থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখার জন্য কতিপয় বুদ্ধিজীবী আর একটি অবাস্তব প্রস্তাব রেখেছিলেন। সেটি হল পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এটিরও প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রতিবাদে বলেন, "সাহিত্যিক ভাষা সকল দেশেই স্থানীয় ভাষা হইতে কিছু না কিছু পৃথক হইবে। আমি জানিতে চাই পূর্ববঙ্গের কোন স্থানের ভাষা সাহিত্যের বাহন হইবে? তারপর জিজ্ঞাস্য যে, ব্যাকরণও কি পূর্ববঙ্গের হইবে? এখন কেহ বলিতে পারেন, আমি ঢাকা জেলার লোক, কেন অন্য জেলার ভাষা বলিব বা লিখিব? এইরূপে প্রত্যেকে যদি সাহিত্যে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন তবে সে কি একটি Tower of Babel সৃষ্টির মত হয় না (সিলহেট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ১৯৫৩)।

১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমাবেশে তিনি শুধু বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথাই বলেন নি সোজাসুজি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। এমন বজ্রকণ্ঠে বলার হিম্মৎ তখন আর কারো ছিল না। তিনি সেদিন বলেছিলেন

: We educationists should, however emphatically protest and if necessary should revolt against the fresh imposition of any language other than Bengali as the medium of instruction for East Bengalee students. This imposition will be tentamount to the genoside of East Bengalees **অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত। এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নূতন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যারই সামিল হইবে।**

১৯৮৫ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে 'মোদের গরব

মোদের আশা' নামে শ্রদ্ধাঞ্জলির যে ক্যাসেট বেরিয়েছে তাতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ঐ কয়টি কথা পাঠ করা হয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিলনা কিন্তু ভাষা আন্দোলনে তিনি ছাত্রসমাজের ভূমিকাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেদিনকার আন্দোলনের জাগ্রত বিবেক। মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) 'কবর' নাটিকায় যে মুর্দা ফকিরের চরিত্র অংকিত করেছিলেন সেটি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ভাষা আন্দোলনে ভূমিকার আদলে রচিত বলে অনেকে মনে করেন। মুর্দা ফকির যেখানে জ্যান্ত মানুষকে দেখিয়ে বলছে, 'জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝো? দেখলে চিনতে পারবে?···তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দয়া করে না। পাগলেও না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরে নি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নীচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।' ১৯৫২, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যে স্থানে ছাত্ররা গুলিতে নিহত হয় সেই স্থানে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছাত্ররা রাতারাতি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে শহীদ মিনার তৈরি করে ফেলে। ভোর হবার আগেই পুলিশ সেটি ভেঙে ফেলে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোয় এত বেশি ক্ষুব্ধ হন যে ভোরের নমায পড়েই সোজা সেই ভাঙা শহীদমিনারে এসে উপস্থিত হন। পরণে তাঁর ছিল কালো আচকান তার মাথায় ছিল কালো টুপি। তিনি ডাক দেন কে কোথায় আছ বেরিয়ে এস, আবার মিনার গড়ার কাজ শুরু করতে হবে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় যারা প্রাণ দিয়েছে তারা মরে নি, তারা শহিদ হয়ে বেঁচে আছে। কুরআনের আয়েত উদ্ধৃত করে বলেন, "যারা আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় তাদের মৃত বলে না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৬৯) যেদিন ভাষা আন্দোলনের ওপর গুলি ছোঁড়া হয় সে সময়কার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মানসিক অবস্থার কথা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুর্তজা বশীর ধরে বেখেছেন। তিনি বলেছেন, "১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি যখন রক্তাক্ত কাপড়ে ঘরে এলাম তিনি ছুটে এলেন। আমার কাছ থেকে প্রতিটি ঘটনা আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। তারপর তাঁর এক কালো আচকান ছিঁড়ে টুকরো কাপড়টি বেঁধে দিতে বললেন তাঁর বাঁ হাতে। আমার হাতেও নিজে বেঁধে দিলেন। বললেন, নিজের মাতৃভাষার জন্য যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোনো দুঃখ থাকতো না।" (আমার বাবা ও আমি ঃ দৈনিক পাকিস্তান) ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করার ফলে সরকারের কাছে তিনি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না আর তিনিও তাদের প্রিয় হবার চেষ্টা করেন নি। মোনায়েম খাঁর আমলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একবার এক সভা করেছিলেন—তাতে তিনি কিছু আপত্তিজনক কথা বলেন। তাঁর কথার

প্রতিবাদ করার জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান কিন্তু আয়ুব খাঁ তাঁকে বসিয়ে দেন। সভাশেষে আয়ুব খাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য মোনায়েম খাঁ শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে অনুরোধ করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঘৃণার সঙ্গে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বাড়ী চলে আসেন। আর একবার করাচীতে আদমজী ও দাউদ সাহিত্য পুরস্কার বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে এক সভায় আয়ুব খাঁর পাশে তাঁকে বসতে হয়েছিল। করাচীর উর্দু কলেজে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে আয়ুব খাঁর ভাষণ দেবার কথা ছিল তারপরের দিন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে করাচীতে ঐ দিন থাকার জন্য আয়ুব খাঁ অনুরোধ করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। প্রেসিডেণ্টের মুখের ওপর এরকম কথা বলায় আয়ুব খাঁ ক্রুদ্ধ হন এবং সভাশেষে কোন বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে চলে যান। সভান্তে আয়ুব খাঁর মুখ্যসচিব প্রমুখ শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে ঐদিন থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁদের মুখের ওপব সোজাসুজি বলে দেন যে আগামীকাল তিনি ঢাকা ফিরে যাবেন এবং প্রেসিডেণ্ট এমন কোন বিশেষজ্ঞ নন যে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য তাঁকে থেকে যেতে হবে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান 'হিলালি-ই-ইমতিয়াজ' শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে দেবার প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানেব গবর্ণব মোনায়েম খাঁ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁব কাছে একবার কবেছিলেন। আয়ুব খাঁ এই প্রস্তাবে অগ্নিশর্মা হয়ে মোনায়েম খাঁকে খেঁকিয়ে উঠেছিলেন বলেছিলেন তাঁর মত একজন রাষ্ট্রদ্রোহী অভদ্র-লোককে খেতাব দেওয়া হবে না। আয়ুব খাঁ তাঁর প্রতি এমনই রুষ্ট ছিলেন যে Indian Council of Cultural Relations-এর সম্মানজনক ফেলোশিপ গ্রহণে সম্মতি দেন নি। তাঁকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয় নি। সরকার তাঁকে যেটুকু সম্মান দিয়েছেন সেটুকু বাধ্য হয়েই দিতে হয়েছে কারণ তিনি ছাড়া পূর্ব বাংলায তাঁর মত দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিল না।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব বহুবার সম্বর্দ্ধিত ও সম্মানিত হয়েছেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয় এই প্রতিষ্ঠানের তিনি তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬১-৬৫ পর্যন্ত তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক ছিলেন। ১৯৬৩-৬৭ দাউদ-পুরস্কারের প্রধান বিচারক, এলিয়াস ফ্রঁসেজ-এর সভাপতি, ইকবাল একাডেমির পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান আমলে আয়ুব খাঁর আগে বাংলা সাহিত্য সেবার জন্য ১৯৫৮, ২৩ শে মার্চ 'প্রাইড অফ পারফরমেন্স' পদক ও দশ হাজার টাকা এবং ইয়াহিয়া খাঁর শাসনকালে তাঁকে মরণোত্তর 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করা হয় (১৯৬৯ আগস্ট)। তাঁর সম্মানে ১৩৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য-পত্রিকা' (১৩৭২ বর্ষা সংখ্যা) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্যিকী' (শরৎ ১৩৭২) নিবেদিত হয়। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান এশিয়াটিক

সোসাইটি তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানান এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত Muhammad Shahidullah Felicitation Volume প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান লেখকসঙ্ঘের পূর্বাঞ্চল শাখা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানান এবং মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ্ সংম্বর্ধনা গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য ১৯৫২ সালে ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি দেন। আরবী ও ফারসীতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার জন্য আজানগাছির পীরসাহেব 'বাহার-উল-উলুম' উপাধি দেন। ১৯৬৭, ৯ই মে লাহোরের Linguistic Research Group of Pakistan থেকে ড. আনওয়ার এস. দীলের সম্পাদনায় Shahidullah Presentation Volume প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের ১৪ই জুলাই ফরাসী জাতীয় দিবসে ঢাকাস্থ ফরাসী কনসাল এক সভায় তাঁকে পদকসহ 'সেভলেয়ার দ্যে লা অর্দার দ্যেস আর্ট'স এত দ্য লেত'স' খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৭৪, ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে মরণোত্তর 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাঁর সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মুদ্রিত হয়েছিল তাতে তাঁর কাছে জাতির ঋণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল "গবেষক, প্রবন্ধকার, অনুবাদক, কবিতা-লেখক, ধর্মবেত্তা ও বাগ্মী হিসেবে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন রূপকথার নায়ক, এদেশের ছাত্র ও শিক্ষক তাঁরই সৃষ্টি। ন্যায় নীতি, যুক্তি ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের অবলম্বন। স্বধর্মনিষ্ঠ হয়েও তিনি ছিলেন সর্বমানবপ্রেমিক। পৃথিবীর কোন প্রলোভন ও ঝুঁকি তাঁকে কখনও কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। তাই তিনি প্রভূত ক্ষতি ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিয়েও ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভেই তাঁর অমর ঘোষণা করেছিলেন : 'যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।' আমৃত্যু জ্ঞানের সাধনা, মাতৃভাষার সেবা, সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যসংগ্রাম, শিক্ষকতায় নিবেদিত চিত্ত, অকুণ্ঠ দেশপ্রেম ও সর্বমানবপ্রীতি এবং পণ্ডিতজনোচিত সরলতা ও বিনয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে অমর করে রাখবে। তিনি আমাদের এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি এদেশের গর্ব, এ দেশের পরিচিতি।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম ছাত্রাবাস তাঁর নামে উৎসর্গকৃত' রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলাভবন, বাংলা একাডেমির গবেষণাকক্ষ তাঁর নামে নামাঙ্কিত। তাঁর নামে ঢাকা বক্সীবাজারে একটি কলেজও স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮০, ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পদক ও দশ হাজার টাকা মরণোত্তর পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়।

দীর্ঘজীবনে শহীদুল্লাহ্ সাহেব বহু সভাসমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন কখনো সভাপতি, কখনো প্রধান অতিথি কখনো উদ্বোধকরূপে। বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ১৯৪৫ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদের জন্য যে আবেদনপত্র

দিয়েছিলেন তাতে তিনি যে কটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্রবের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই অংশটি এখানে তুলে দিচ্ছি

ঃ I have presided over a number of conferences among which I should like to mention the Philology section of the All India Oriental Conferences Hyderabad (Deccan) session in 1941. I am member of the Standing Council of the All India Muslim Educational Conference Aligarh and of the Nadwatul Ulama Lucknow and of the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta. I am one of the foundation member of the Visva-Bharati of Rabindnanath Tagore.

আজীবন শিক্ষক হয়েও তিনি ছাত্রছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। স্বল্প বেতন হলেও অধ্যাপনাকে তিনি আঁকড়ে থেকেছেন মাঝে-মধ্যে অন্য কাজ নিলেও অধ্যাপনাতে বারবার ফিরে এসে স্বস্তি পেয়েছেন। নিজস্ব গ্রন্থাগারে পাঠে নিমগ্ন থাকতেন, প্রায় প্রতিরাত্রেই ঢাকা দেওয়া ঠাণ্ডা ভাত খেতে হত স্ত্রীর শরীর সুস্থ থাকলে তিনি গরম করে দিতেন। নিজের গ্রন্থাগার ছাড়াও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করতেন। পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে গ্রন্থাগার বন্ধের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেত। এমনও হয়েছে গ্রন্থাগারে কেউ নেই ভেবে দারোয়ান দরজা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেছে। যখন হুঁশ হয়েছে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হয়েছে। দারোয়ানকে ডেকে এনে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়েছে।

পাণ্ডিত্যের অহংকার তাঁর ছিল না। তিনি বিনয়ী ও বিনম্র ছিলেন বয়সে বড় যাঁরা তাঁদের তিনি কদমবুসী করতেন আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৮-১৯৫৭) প্রমুখর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন। তাঁরা তাঁকে তুমি বললে ভারী খুশি হতেন অথচ তিনি ছোট বড় সবাইকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন – কেউ যদি আপত্তি করত তখন তিনি তাকে 'তুমি' সম্বোধন করতেন।

আজীবন তিনি মিতব্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। সব কাজ নিজে করতেন। বিপুল খ্যাতি ও পদ মর্যাদার অধিকারী হয়েও তিনি তাঁর অধঃস্তন কর্মচারী কিংবা পিওন চাপরাসীদের ওপর নির্ভর করতেন না। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁর এই আত্মনির্ভরশীলতার একটি চিত্র ড. গোলাম সাকলায়েন দিয়েছেন—

ঃ রাজশাহীতে তাঁর পরিবার-পরিজনের কেউ থাকতেন না। তিনি একাই থাকতেন, নির্ভর করতেন আত্মশক্তির উপর। খোদাতালার উপর ভরসা রেখে তিনি একাই চালাতেন সব কাজ। মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় আরদালি ফরমাস খাটতো। তিনি বলতেন ঃ 'আল্লার দেয়া হাত-পা রয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, আর কি চাই। আমার কোনোই অসুবিধা হয় না।'…আরদালি কাজ করলে তাকে নিজের পকেট

থেকে আলাদা টাকা দিতেন। নিজের হাতে কাজ করতে কোনদিন তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি।···নিজে কলমে কালি ভরে নিচ্ছেন। পেন্সিল কেটে নিচ্ছেন, স্টোভ ধরিয়ে চা করে নিচ্ছেন। ট্রাঙ্ক খুলে জামা-কাপাড়, শেরওয়ানি পায়জামা, টুপি, জায়নামাজ বের করে নিচ্ছেন। আবার দেখেছি গোসলের সময় ময়লা গেঞ্জিটা সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছেন। (অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, পৃ ৩০, ১৯৭০)

দানে-ধ্যানে তিনি দিলেন মুক্তহস্ত। শুধু দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী নয় সাধারণ গরীব মানুষ তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। কার মা মৃত্যু শয্যায় ওষুধপত্র কেনার পয়সা নেই, মৃত ব্যক্তির কাফনের টাকা নেই, অর্থাভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, হাসপাতাল থেকে বাড়ী যাবার রাহাখরচ নেই সবাইকে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতেন। নিজের সাতপুত্র ও দুই কন্যা (মাহযুযা খাতুন, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ মাসরুরা খাতুন, মুহম্মদ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্, মুহম্মদ যকিয়্যুল্লাহ্, মুহম্মদ তকিয়্যুল্লাহ্ মুহম্মদ নকিয়্যুল্লাহ্, মুহম্মদ রাযিয়্যুল্লাহ্, মুহম্মদ মুর্তজা বশীর) থাকা সত্বেও অনেক অনাথ আতুর কন্যাকে নিজের বাড়ীতে লালন পালন করে বিয়ে দিয়েছেন, নিজের মেয়ে জামাইকে যেমন আদর যত্ন করেছেন তেমনি তাদেরও করেছেন। বাইরের থেকে আপন-পর বোঝাব কোনো উপায় ছিল না। একবার তাঁর ছোট মোটর গাড়িতে একটি বছর দশেকের মেয়ে হঠাৎ চাপা পড়ে, আঘাত গুরুতর ছিল না, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত তার শিয়রের কাছে বসেছিলেন। মেয়েটি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন হাসপাতালে খাবার নিয়ে যেতেন। সুস্থ হয়ে যাবার পরও তিনি খবরাখবর নিতেন এবং বিয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। মানুষজন চাপা পড়ে মারা গেলে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে তার চেয়ে গাড়ি বেচে দেওয়াই ভাল। গাড়িটি তিনি বিক্রী করে দেন। পরে তাঁর বড় ছেলে সফিয়্যুল্লাহ্ যখন গাড়ী কেনেন, সেই গাড়িতেও তিনি চাপতে চাইতেন না। বলতেন গাড়ি করে গেলে রাস্তাঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে শুধু মাথা বা হাত নেড়ে চলে যেতে হয় দুদণ্ড তাঁর কুশলবিনিময় করা যায় না কাজেই মোটরের থেকে রিক্সা ভাল। একবার যদি কেউ তাঁর বাসায় কাজ করার জন্য রয়েছে সে চিরকালের মত তাঁর কাছে থেকে গেছে। তাঁর মাসিক আয় কোনকালেই বেশি ছিল না এমন কি ধারকর্জ করে পড়ার জন্য বিদেশ গিয়েছেন, দেনা তখনও শোধ হয় নি তখনও তিনি কাউকে বিমুখ করেননি।

ছেলেরা যখন সাবালক হয়েছে নিজের ছেলে কি পরের ছেলে সবার ক্ষেত্রে তিনি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁর বড় ছেলে সফিয়্যুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তৎকালীন ছোটলাট স্যর জন হার্বার্ট চেয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ছাত্ররা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুক এবং শিক্ষকরা তাঁদের বেতনের কিছু অংশ যেন যুদ্ধভাণ্ডারে

দান করেন। ছাত্ররা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে শিক্ষক ও প্রভোস্টদের নিয়ে সভা ডাকেন। এই সভায় প্রকাশ হয়ে পড়ে যে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছেলে এর মূলে রয়েছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে এবিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়—তিনি সোজাসুজি বলে দেন ছেলে প্রাপ্ত বয়স্ক, তার কাজে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে তাঁর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ছেলেকে বহিস্কার করার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি এক সভা আহ্বান করে। অধ্যাপক সত্যেন বোস (১৮৯৪-১৯৭৪) ও হরিদাস ভট্টাচার্যের তীব্র বিরোধিতায় দণ্ডাদেশ নাকচ হয়ে যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে না থাকলেও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি একটি ভাষণে বলেছিলেন —

> ঃ আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে অন্য অন্য শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষা প্রত্যেকের পক্ষে আমি ফরজ বলেই মনে করি। দরকার হলে চাই কি তাদের সব পড়াশুনা ছেড়ে দেশের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে। কিন্তু ছাত্রজীবনে রাজনীতি শিক্ষা (Political training) এক কথা আর রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া (active participation in politics) আর এক কথা। এই শেষ জিনিসটায় এমন এক নেশা আছে, যে তাতে মাতলে আর সব ভুল হয়ে যায়। ছাত্রদের পক্ষে সেটা মস্ত ক্ষতি, দেশের পক্ষে সেটা মস্ত ক্ষতি। মনে রেখো ছাত্রের দল, রাজনীতিতে হাতে কলমে যোগ দেবার জন্য সমস্ত জীবন পড়ে আছে, কিন্তু পড়াশোনার জন্য বেশী সময় নেই। (অভিভাষণ, নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন, কলিকাতা ১৩-১৪ অক্টোবর ১৯২৮)।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছাত্ররা পড়াশুনা কিভাবে করবে স্বাস্থ্যরক্ষা কিভাবে করবে, ছাত্রজীবনে কী কী সেবামূলক কাজ তারা করতে পারে তার একটি তালিকা ১৯১৮ ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মুসলমান ছাত্র সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে দিয়েছিলেন। তার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে আছে কিনা তার মধ্যে না গিয়ে বলব তিনি নিজের জীবন ঐ ছকে গড়ে তুলেছিলেন। এখানে শুধু প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি তুলে দেওয়া হল—

> **ঃ প্রথমে চাই—কর্মের রুটিন। দৈনন্দিন কর্তব্য কার্য কোন সময়ে করিবে তাহার তালিকা করিবে। এই রুটিন বা কার্যতালিকা অনুযায়ী ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট কার্য করিবে।**
>
> **শয্যাত্যাগ ৫॥**
>
> **প্রাতঃকৃত্য ৫॥ হইতে ৬**
>
> **নমায ও কুরআন পাঠ ৬ –৬॥**
>
> **পাঠ ৬॥ –৯॥**
>
> **স্নান আহার স্কুলে গমন ৯॥—১০॥**
>
> **স্কুল, জোহর নমায ১০॥ –৪**

নাশ্তা ৪—৪॥
ব্যায়াম ৪॥—৫॥
নমায বিশ্রাম ৫॥—৬॥
পাঠ ৬॥ —৯॥
আহার, নমায. ডায়রী লেখা ৯॥ —১০॥
শয়ন ১০॥ ৫॥

ঃ তোমাকে দুইটি প্রধান মূলধন লইয়া কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে—একটি অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন শরীর, দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মস্তিষ্ক। ..মনে কোন কুচিন্তা স্থান দিবে না। ..তোমার নয়ন মন যেন তোমাকে বিপথগামী না করে।...সর্বদা সংযত থাকিবে।...প্রত্যহ অপরাহ্নে অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া ব্যায়াম করিবে।... ছুটির দিন একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যায়াম করা উচিত। মধ্যে মধ্যে তিন চার ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করা ভাল। নদ-নদী-প্রধান দেশে সন্তরণ শিক্ষা করা সকলের কর্তব্য। এগুলি ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসিতে পারে।...সংসার যেন যুদ্ধক্ষেত্র, ছাত্র-জীবনে তাহার শিক্ষার্নবিশী সময়। এখন হইতেই যদি যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগিরূপে আপনাকে শিক্ষিত না কর, সংসার সমরাঙ্গণে তোমার মরণ বা পরাজয় নিশ্চিত।

ঃ ছাত্র অবস্থায় জগতের সেবার জন্য তোমরা কি কি কাজ করিতে পার নমুনা স্বরূপ তাহার একটি তালিকা দিতেছি —

১. সহপাঠি কিংবা নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রের পড়া বলিয়া দেওয়া।
২ অসুখের সময় এক হোস্টেলের ছাত্রের বা বাড়ীর লোকের সেবা করা।
৩. জলপানের পয়সা হইতে গরিব ছাত্রের কাগজ, কলম, বহি ইত্যাদি কিনিয়া দেওয়া।
৪. রাত্রিকালে তোমার আলোতে অন্যকে পড়িতে দেওয়া।
৫. অবসর সময় সদ্গ্রন্থ বা সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া বাড়ির লোকদিগকে কিংবা পাড়া প্রতিবেশীদিগকে শুনান।
৬. পাড়ার ছোট ছেলেপিলেদিগকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া।
৭. হাটের দিনে নিঃসহায় পড়শীর হাট করিয়া দেওয়া।
৮. অন্ধ খঞ্জকে হাত ধরিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া।
৯. দরিদ্র নিঃসহায়দিগের জন্য হাসপাতাল হইতে ঔষধ আনিয়া দেওয়া।
১০. মহামারীর সময় পাড়া প্রতিবেশীগণকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া।
১১. দুর্ভিক্ষাদি প্রপীড়িতগণের সাহায্যের জন্য দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাত্রগণ, সকল সময় যেন মনে থাকে বাড়ী হইতেই দানক্রিয়া আরম্ভ হয়। তোমার

আশপাশের অভাব না ঘুচাইয়া তুমি বিশ্বের অভাব ঘুচাইতে যাইবে ইহা তোমার কর্তব্য নহে।

প্রকৃত শিক্ষকের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক -ছাত্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করা, নিজের বৃত্তিকে ভালবাসা, ছাত্রের সান্নিধ্যে থাকা। আদর্শ শিক্ষকের এই তিনটি গুণের অধিকারী হয়ে তিনি ছাত্রপ্রিয় হয়েছিলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে ছাত্রদের সুখ-শান্তির কথাও চিন্তা করেছেন। ক্লাসে বাড়িতে অফিসে এমনকি অবসর গ্রহণ করার পর বাংলা একাডেমিতে কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছাত্রছাত্রী কোনো কাজকর্ম নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে সব কাজকর্ম ফেলে দিয়ে আগে তাদের কাজ সাধ্যমত করে দিতেন। ছাত্রদের জন্য চাকরীর খোঁজ খবর করা, সুপারিশ পত্র লিখে দেওয়া, তাদের বিয়ে পড়ানো ত তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাঁকে বিয়ের ঘটকালিও করতে হয়েছে। ছাত্রছাত্রী ভালবেসে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাদের বাবা মা রাজী নন। অগতির গতি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের তাঁরা শরণাপন্ন হয়েছেন—বর কনের বাবা তাঁর ছাত্র কাজেই শিক্ষকের কথা বাবা অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজের কাজ ফেলে পাত্রপাত্রীর বাবাকে ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের শুধু আকদ পড়ানো নয় তাদের ছেলে-মেয়েরও শাদী পড়িয়েছেন। ড. কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, "আমার দুটি পুত্রের বিবাহেও শরীক হয়ে আমাকে সরফরাজ করেছেন। একটি ছেলের বিবাহে তিনি নিজে খোদবা পড়িয়েছিলেন, এর অপরটির বিবাহেও তিনি মুনাজাত করেছিলেন।" (ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে যেমন দেখেছি ঃ শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ পৃ ২০৬) বিয়ের আকদ যেমন পড়িয়েছেন তেমনি বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাজার ইমামতিও তাঁকে করতে হয়েছে। সাহিত্যিক আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কবি গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কাজী মোতাহার হোসেনের দুই পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যুতে শেষ প্রার্থনার ইমাম হতে হয়েছিল। সামাজিক কর্তব্যের দায়দায়িত্ব সবসময় নির্বাহ করেছেন। তিনি অনেক ছাত্রকে জায়গীর ঠিক করে দিতেন নিজের বাসাতেও অনেককে রাখতেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিখ্যাত লেখক মুহম্মদ আবুতালিব তাঁর বাসায় থেকে পড়াশুনা করেছেন। যারা গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়াশুনা করত হোস্টেল মেসে থাকত সময়মতো অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা না এলে পকেট থেকে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে হস্টেলের চার্জ মিটিয়ে দিতেন। পরে ছাত্র টাকা ফেরৎ দিতে এলে টাকা কোনরকমে ফেরৎ নিতেন না তার বদলে বই কিনে ভাউচার দেখাতে বলতেন। ছাত্রদের মধ্যে কারোর মৃত্যুসংবাদ পেলে অঝোর নয়নে কাঁদতেন—নমাযের শেষে তার রূহের মাগফিরাৎ কামনা করতেন, তার নামে দো'আ দরূদ পাঠ করতেন। অনেক ছাত্র তাঁকে ঠকিয়েছে, আঘাত দিয়েছে, সনাতনপন্থী বলে অনেকে তাঁকে অপদস্থ করেছে, বৃদ্ধ বয়সে কঠোর শ্রম দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার পর তাঁরই ছাত্রসহকর্মী

অধ্যাপকদের চক্রান্তে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে চোখের জলে, যা তিনি পছন্দ করতেন না তা করে তাঁকে অপমানিত করেছে কিন্তু বিপদে পড়ে তাঁর কাছে যখন তারা ছুটে এসেছে তাদের সব দোষত্রুটি ভুলে নিজের পুত্র ভেবে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের কাজ করে দিয়েছেন। কর্মজীবনে উন্নতি কিংবা সাহিত্যক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতিষ্ঠার খবর পেলে খুব খুশি হতেন। ছাত্রদের রচনাদি আগ্রহ সহকারে পড়তেন, ভাল লাগলে দোষত্রুটি থাকলে পত্র মারফৎ তা জানাতেন। তাঁর অগণিত ছাত্রদের মধ্যে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) অন্যতম। 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ-ডি পান। ড. ভট্টাচার্য একটি চিঠিতে তাঁর কাছে ঋণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন. "ছাত্র হিসাবে চার বছর, গবেষক হিসাবে দুই বছর এবং সহকর্মী হিসাবে ১০ বছর তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে চাকুরী দিয়ে তাতে স্থায়ী করেছিলেন, ছাত্রজীবনে নানাভাবে আমাকে সাহায্য এমনকি অর্থ সাহায্যও করেছিলেন ; তাঁর সহৃদয়তা না থাকলে কোনদিন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতাম না।··· আমার মনে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কনভোকেশনের সময় যখন আমি আমার পি. এইচ ডি ডিপ্লোমা আনতে যাই (১৯৫৯) তখন তিনি আমাকে সমবেত বিদ্বজ্জনের প্রত্যেকের সামনে হাত ধরে নিয়ে উপস্থিত ক'রে সবার সঙ্গে এই ব'লে আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন যে এই আমার প্রথম ছাত্র যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি পেলো।···আমার প্রতি স্নেহবশত তিনি আমার মৈমনসিংহের বাড়িতে গিয়েছেন, আমার পিতার সঙ্গেও তাঁর সুদৃঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছিল।" (লেখককে লিখিত পত্র ১৫. ৫. ১৯৬৯) এ প্রসঙ্গে নীলিমা ইব্রাহিমের পি-এইচ-ডি প্রাপ্তির কথা বলা যেতে পারে। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), কনেভেনার ছিলেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব, পরীক্ষক ছিলেন ড. সুকুমার সেন ও ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪), বিষয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক। পরীক্ষক দুজ'ন ডিগ্রী প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ গবেষণাপত্রে নাটকের ওপর কোন নতুন কথা বলা হয়নি, জানা তথ্যগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে গবেষণা নিবন্ধের পরীক্ষক হিসেবে তাঁর ও সুকুমার সেনের অভিমত পত্র মারফৎ জানান—"নিবন্ধের গুণ বিচার করিয়া আমরা এই নিবন্ধের জন্য পি. এইচ-ডি উপাধির জন্য সুপারিশ করিতে ইচ্ছুক নই ; তবে এই জাতীয় গবেষণা কার্যে কিছু উৎসাহ দিবারও প্রয়োজন আছে ; আবার উৎসাহ দিবার জন্য সুপারিশেরও দায়িত্ব আছে। আমরা এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে চাই। আপনার মতামত জানিতে পারিলে প্রয়োজনবোধে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে পারি। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াই আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।" বলা বাহুল্য

শহীদুল্লাহ্ সাহেব নীলিমা ইব্রাহিমকে পি-এইচ-ডি দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। প্রথমত গবেষণার যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি তাঁর ছাত্র, দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে মহিলারা যাতে বাংলা গবেষণা কার্যে বেশি করে এগিয়ে আসেন সেজন্য উৎসাহিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস পরীক্ষকরূপে তাঁর কাছে অসংখ্য গবেষণাপত্র আসত। তিনি শুধু পড়তেন না, ভালো লাগলে ভালো বিষয় হলে অভ্যাগত ছাত্র অধ্যাপকদের অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনাতেন। অধ্যাপক থাকাকালীন প্রতিবছর এম. এ. ক্লাশের ছাত্রদের বিদায়কালীন ভোজ-সভার ব্যবস্থা করতেন—তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য উপদেশ দিতেন—

ঃ মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ভালবাসবে।

সংস্কারমুক্ত পরিছন্ন মন নিয়ে জীবনের সব সমস্যার সমাধান করবে।

সত্যের উপাসক হবে।

ছাত্রদের শুধু অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি জাগ্রত করতেন না, অধ্যাপকদেরও সুপ্ত প্রতিভাকে লোক সমক্ষে প্রকাশ করার জন্য জোর তাগিদ দিতেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যক্ষ ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব তাঁর থিসিস প্রকাশনায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনবরত তাগিদ দেবার কথা বলেছেন।

তিনি বরাবর অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। খাওয়াতে ও খেতে ভালবাসতেন। বড় মেয়ের বিয়েতে প্রতি চারজনে একটি করে মুরগী মোসল্লামের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাড়ীতে মেহমান বা ছাত্র অভ্যাগত এলে তাঁদের সম্মানে বিশেষ খানা-পিনার ব্যবস্থা করতেন। মাংস খেতে বেশী ভালবাসতেন—গোস্তপরোটা তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল, তার সঙ্গে একটু মিষ্টি ও ফল থাকলে ভাল হত। কফি বা চায়ে বেশি ঘন দুধ দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করতেন। দুপুরে ভাত ডাল ভাজা মাংস বা মাছ দই পুডিং। বিকেলে ডিম সিদ্ধ বা পোচ কিছু ফল কয়েকপিস পাউরুটি আর চা এক কাপ। রাত্রে মাছ বা মাংস সহযোগে ভাত বা রুটি। পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে সাদাসিধে ছিলেন—যুবা বয়সে বেশবাসের দিকে একটু সৌখীনতা ছিল। প্রথম প্রথম প্যারিস থেকে ফিরে স্যুট কোট টাই পরতেন। পরে শেরওয়ানি কোর্তা এবং লম্বা টুপি পরতেন এবং এই পোষাকেই তাঁকে ঋষিকল্প মহাপুরুষ বলে মনে হত আর এটাই ছিল তাঁর চিরাচরিত অভ্যস্ত পোষাক। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শরীর চর্চাও করতেন। যুবক বয়সে এমনকি প্যারিসে গিয়েও লেখাপড়ার সঙ্গে ব্যায়াম করেছেন। একটি পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, "স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। প্রায় ১২॥ সময় শুই এবং ৭টার সময় উঠি। ফজরের নমায পড়িয়া স্যাণ্ডোর Spring-Dumb-bell লইয়া ব্যায়াম করি এবং ৪০টি বৈঠক ও ২০টি ডন করি।" (প্যারীর পত্র ৬.১.১৯২৭) বৃদ্ধ বয়সে হাঁটা চলা অব্যাহত রেখেছিলেন—বাড়ির সামনের মসজিদে হেঁটে নমায পড়তে যেতেন। কদাচিৎ তাঁর অসুখ বিসুখ হত। ১৯৬৩ সালে তাঁর শরীর প্রথম অসুস্থ হতে

আরম্ভ করে। ১৯৬৪ সালে রোযার শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন এবং ছত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী হিক্কায় কষ্ট পান। কিছুদিন পর বাংলা একাডেমিতে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' ও আঞ্চলিক অভিধান সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থাকার সময় তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে এবং কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯৬৫ সালে রমযান মাসে বুকের অসুখ দেখা দেয়। এক শুক্রবার নমাযের জামাতে তাঁর বুকের অসুখ একটু বেশি মাত্রায় দেখা দেয়, চিকিৎসক তাঁকে রোযা ভেঙে পুরো বিশ্রাম নিতে বলেন। কিন্তু রোযা ভাংতে তিনি রাজি হন নি যেমন রাজি হননি ১৯১৩ সালে বন্ধুদের পরামর্শে রোযা ভেঙে ডাক্তারের সামনে হাজির হতে। পার্থিব সুখের জন্য ধর্মের অনুশাসন ভাঙা নৈতিক অপরাধ বলে মনে করতেন। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে তিনি পূর্বের মত কর্মক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হন। সেদিন ছিল ২৪শে রমযান নিয়মিত রোযা রেখেছেন, ২০শে রমযান থেকে বাড়ির নিকটস্থ চকবাজারের বড় মসজিদে এ'তেকাফ (মসজিদে নির্জনে নীরবে ধর্মপালন) পালন করছেন। প্রায় তিনটের সময় আশরের নমাযের কাতারে দাঁড়াতে গিয়ে অসুস্থবোধ করেন —সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন কিন্তু জ্ঞান হারান নি। মগরিবের আযান শুনে এফতারি করেন। শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাঁকে জোর করে বাড়িতে আনা হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৯নং কেবিনে ভর্তি করা হয়। প্রাদেশিক সরকার তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তাঁর ডানপাশ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়—ভালভাবে কথা বলতেও পারেন না, হঠাৎ লোক চিনতে পারেন না। ডাক্তার নুরুল ইসলামের চিকিৎসাধীনে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে থাকেন। তাঁর ৮৪তম জন্মবার্ষিকী হাসপাতালে পারিবারিক পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। টিপসই দিয়ে এমিরিটাস অধ্যাপকরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই মওলানা আকরম খাঁও (১৮৬৮-১৯৬৮) অসুস্থ হয়ে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। একটু সুস্থ হয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেব হুইল চেয়ারে বসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। যেতে যেতে রোগীদের বেডের কাছে গিয়ে তাদের শারীরিক সংবাদও নিতেন। হাসপাতালে তাঁর শরীরের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। ১৯৬৮ সালে অগাস্ট মাসে তাঁর নিজস্ব বাস ভবন ৭৯ বেগমবাজার রোডস্থিত 'পেয়ারা হাউস'-এ তাঁকে আনা হয়। শেষ জীবনে তাঁকে দুটি শোকাঘাত সহ্য করতে হয়। হাসপাতালে অবস্থানকালে ১৯৬৮, ২৬ শে জুলাই তাঁর পত্নী মরগুবা খাতুনের মৃত্যু হয়। বাড়িতে এসে তিনি শূন্যতা বোধ করতে থাকেন। পত্নীবিয়োগের পর রফিক নামে এক পরিচারক তাঁর তত্ত্বাবধান করত। দোতলার একটি কুঠরিতে থাকতেন—খাট ছিল দুটো একটা নিজের আর একটা পরিচারকের। আর ছিল একটি টেবিল ও তিন আলমারি বই। বেশীক্ষণ পড়তে পারতেন না, শরীর কাঁপত তবু ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত পড়ে যেতেন। তাঁর লাইব্রেরী ছিল নীচের তলায়। নীচের তলায়

তাঁকে আনা হলে বইগুলি দেখে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তো—পূর্বের মত নাড়াচাড়া করতে পারতেন না, বইয়ে শুধু হাত বুলোতেন। লাইব্রেরী ঘরের পাশে ছিল একটি মেহেদী গাছ। এই মেহেদী গাছটি তাঁর স্ত্রী লাগিয়েছিলেন। মেহেদী ডালের পাতা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন, কত কথা তাঁর মনে পড়ত, আর চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরে যেত। দ্বিতীয় আঘাত আসে তাঁর পুত্রাধিক ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সংবাদ (১৯৬৯, ৩ জুন) তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। নিজের অসুস্থ অবস্থাতেও হাই সাহেবের পুত্র-কন্যাদের খোঁজ খবর নিতেন। এরপর তাঁর শরীরের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের প্রথমের দিকে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আবার ভর্তি করা হয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ১৯৬৯, ১৩ জুলাই রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৯-৫৮ মিঃ তিনি পরলোকগমন করেন। মাত্র দুদিন আগে তাঁর ৮৫তম জন্মদিবস হাসপাতালে পালিত হয়। তার জন্মদিবস কিভাবে পালিত হয়েছিল তার বিবরণ ১৪ জুলাইয়ের 'দৈনিক পাকিস্তান' সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুতে রচিত সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারি—"প্রিয়জনের কাছ হইতে এই দিন কিছু ফুলও তিনি উপহার পাইয়াছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে রোগে পাণ্ডুর পরিবেশে জ্ঞান ও সৌন্দর্যের এই আজীবন সাধক ফুলের এ সৌরভ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পারেন নাই জন্মদিনের আনন্দে অবগাহন করিতে। এই দিনটির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি ক্ষীণ গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়াছিল : 'আর কতদিন'। হয়তো সেই মুহূর্তে শিয়রে তিনি মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন আর কোন জন্মদিনের প্রয়োজন তাঁহার নাই।" পূর্ববঙ্গের প্রতিটি কাগজে শুধু তাঁর মৃত্যুসংবাদ নয় তাঁর কর্মময় জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোকচিত্র সহযোগে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং প্রতিটি কাগজে তাঁর ওপর সম্পাদকীয় রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ এপার বাংলার কাগজেও বেরিয়েছিল সেটি শুধু সংবাদ হিসেবেই—তার চেয়ে বেশি কিছু নয় আর পাঁচজনের যেভাবে বেরোয় ঠিক সেইভাবেই। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৪ই জুলাই অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদের সদস্যরা দু'মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ড. চট্টোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করে বলেন, "ড. শহীদুল্লাহ্ ছিলেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন আমার অগ্রজকল্প, ভাষাতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, বাঙলার প্রতি ভালবাসাও ছিল তাঁর অপরিসীম। বাঙালী মুসলমান সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি কাজ করে গেছেন। ড. শহীদুল্লাহ্র মৃত্যুতে ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুব হৃদ্যতাপূর্ণ। কলকাতা এলেই তিনি আমার কাছে আসতেন। তাঁর বেশ রসজ্ঞান ছিল, নিজে হাসতে;

জানতেন, অপরকে হাসাতেও পারতেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫. ৭. ১৯৬৯) ১৩৭৬, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় তাঁর সম্পর্কে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মরদেহ ঐদিনই তাঁর প্রিয় শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ক্যাম্পাসের পাশে মুসাখান মসজিদের পশ্চিমে সমাহিত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেবার সময় এই মসজিদে জোহর আশরের নমায পড়তেন এবং ঐ নমাযের ইমামও হতেন। এক সময়ে এই মসজিদের মুতাওয়াল্লিও ছিলেন। নিজের সমাধিলিপি ('মরণ পরে') রচনা করেছিলেন অনেকদিন আগে যা তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র 'বঙ্গভূমি' অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত হল—

ঃ কেহ চাহে মরণ পরে মর্মরে বাঁধন কবর,
শীর্ষে দীর্ঘ প্রস্তর-ফলক কীর্তি তার করিতে অমর।
কেহ চাহে সমাধি তার কুঞ্জবনে নদী-তীরে,
ইচ্ছা মনে, অন্তিম সজ্জায় বক্ষে রাখে প্রকৃতিরে।
কেহ চাহে কাঙাল সাথে ঘাসে ঢাকা দেহের আগার,
দেখে যেন বিশ্বজনে গর্ব নাহি হিয়ায় তাহার।

চাহি নাকো স্মৃতিস্তম্ভ, ওগো চাহি না কোন গোর.
আমিই যখন গেলুম চ'লে, মিছে দেহের ভাবনা মোর।
কাজ নাই মোর স্মৃতিস্তম্ভে, কাজ কিবা মোর মাটির গোরে,
বাঁচতে যদি পারি আমি, বিশ্বমানুষের অন্তরে।

১৯৮৩ সালে আগস্টে বাংলাদেশ গিয়ে তাঁর কবর যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাঁর কবর নিতান্ত অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। এটি যে তাঁর কবর বোঝার কোন উপায় নেই। একটি টিনের সাইনবোর্ড দুদিকে বাঁশ পুতে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানা যায় এটি ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কবর। পুত্ররা পিতার পার্থিব সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মামলা করছে কিন্তু পিতার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যে পুত্রদের ওপরও কিছুটা বর্তায় এটুকু বোধের অভাব দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম। শতবর্ষে তাঁরা কী করেছেন আমার জানা নেই। তবে প্রস্তর ফলক মীনার স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি শহীদুল্লাহ্ সাহেব চাননি, তিনি যা চেয়েছিলেন মানুষের ভালবাসা তা তিনি প্রতিনিয়তই পাচ্ছেন। মসজিদের আযান তাঁর কানে যাচ্ছে, নমাযিরা তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করছেন। জীবিতকালে তিনি যে পরিমণ্ডলে থাকতে ভালবাসতেন মরণের পরও তিনি ঠিক সেই পরিবেশে শুয়ে আছেন॥

২

মনন বৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে সময়ে জন্মেছিলেন সে-সময় মুসলমান সমাজ সবেমাত্র ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছে। হিন্দু সমাজ ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অসামান্য প্রতিভাধরের আবির্ভাবে হিন্দুসমাজ তার ঐতিহ্যকে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে যেমনভাবে পেয়েছে তেমনভাবে মুসলমান তার ঐতিহ্য ধর্ম সংস্কৃতির রূপ তার সমাজে পায়নি কাজেই এখানে ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক পূরণের কাজে যিনি প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১)। তাঁর সমকালে যাঁরা ছিলেন যেমন কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুল রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখের সাহিত্যরচনা ও জাতি গঠনের উত্তরাধিকার রূপেই যাবতীয় দায়দায়িত্ব শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ওপর বর্তিয়েছে। তাঁর সমকালে সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) নজীবুর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), এবং আরো অনেককে। দৃষ্টিভঙ্গী ও পাণ্ডিত্যে তাঁর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য গঠনে তাঁরা সকলেই অংশীদার ছিলেন। সেজন্যে বহু বিচিত্র ধরণের কাজে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে যুক্ত থাকতে হয়েছে। সমাজ-বিমুখ স্বার্থপরের মত আত্মমগ্ন হয়ে তিনি শুধু জ্ঞান চর্চা করেননি নানা বিষয়ে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। শিক্ষকতা অধ্যাপনা ছাড়াও শিশু ও বয়স্কদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, ওয়াজ মহফিল সভা-সমিতিতে যোগদান, সামাজিক নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে সময়দান, মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত জ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক রুচিতে উন্নীত করার দায়িত্ব পালনের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি নানাবিধ কাজ করতে গিয়ে কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হতে পারেন নি, বহুমুখী বিষয় তাঁকে কৌতূহলী করেছিল। নাই নাই করেও তিনি খান সাতচল্লিশ বই লিখেছেন, খান ত্রিশেক পাঠ্যবই রচনা করেছেন আর অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন যা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই গৌণকাজ—একাজ করার মত লোক ছিল এবং পাওয়াও যেত, যে কাজ করার মত লোক ছিল না সহজে পাওয়াও যাবে না সেই Fundamental Research এর কাজে তিনি যথেষ্ট সময় দেননি। কিন্তু

কিছু বিষয়ে তিনি অম্লান স্বাক্ষর রেখেছেন যেমন বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব, চর্যাপদে সমাজধর্ম ও শব্দতত্ত্ব, বাংলা ভাষার জন্মসূত্র নির্দ্ধারণ, চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান, বিদ্যাপতির কাল নির্ণয় ইত্যাদি, কিন্তু এগুলো তাঁর পাণ্ডিত্যের খুচরো কাজ। যেটি তাঁর আসল ক্ষেত্র ছিল সেই ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রবিদরূপে তাঁর খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত শিখরস্পর্শী রচনা (monumental work) ODBL কিংবা নীহাররঞ্জন রায়ের মত 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর অনুকরণে মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন কাহিনীও কি তিনি রচনা করতে পারতেন না ? অথবা যে ইসলাম নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন তাকে নিয়েও কি তিনি একটি নতুন ব্যাখ্যান রচনা করতে পারতেন না ? চর্যাপদ নিয়ে যা গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছিলেন সেগুলির ওপর আরও গভীরভাবে আলোচনা করে বাংলায় একটি প্রামাণ্য বইও কি তিনি লিখতে পারতেন না ? সবকিছুই পারতেন, 'আঞ্চলিক ভাষার' অভিধান সম্পাদনা করে তিনি কতবড় শব্দবিদ তার প্রমাণ রেখেছেন কিন্তু অভিধান ত বহুজনের মিলিত কর্ম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একক প্রচেষ্টা কোথায় ? দু'খণ্ডে 'বাংলা সাহিত্যের কথা,' 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' তাঁর মত মনীষীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি ওইটুকুই ছিল ? সবকিছুই পারতেন তিনি কিন্তু মেধা ও শক্তির ক্ষয় করেছেন সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। সেজন্য ড সুকুমার সেন দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, 'তিনি সাধারণ শিক্ষা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে —যা তাঁর মতন ব্যক্তির পক্ষে বাজে কাজ মনে হয় তাতে লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙলা ভাষা বিষয়ে, অন্যান্য অনেক বিষয়ে, যা খুব মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু সেসব রচনায় তাঁর গবেষণা শক্তির গভীর পরিচয় বেশি নেই।" (শব্দশাস্ত্রবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, চতুরঙ্গ, আগস্ট ১৯৮৪, ৪৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, পৃ ৩০৮) শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এটি যেমন ঘাটতির দিক তেমনি এটি সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরূপে তাঁর সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনেরও পরিচয় দেয় —আর পাঁচজন পণ্ডিতের মত বই দিয়ে মুখ আড়াল করে বসেননি। শহীদুল্লাহ সাহেব ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়েও অন্যধর্ম সম্পর্কে অনুদার ছিলেন না, গান বাজনা না শুনলেও সহজ সরল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের চর্চা করেছেন। সংস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি যদি তাঁকে না বলা হয় তবে সংস্কৃতির অর্থকে ছোট করা হয়।

অনেকেই তাঁকে সংস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি বলে মনে করেন না কেননা নিজ ধর্মের ওপর তিনি এমনই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে গান বাজনা শোনা বা ছবি আঁকা হারাম বলে মনে করতেন। গ্রামোফোন ভেঙে দিয়েছিলেন, কীর্তন শ্যামাসঙ্গীত দূরের কথা রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্র গীতি শুনতেন কিনা সন্দেহ। এগুলো দেখলে বা শুনলেই কি তাঁকে সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি বলতে হবে ? সংস্কৃতি প্রকাশ পায় মানুষের আচার আচরণে ব্যবহারে এবং জীবনযাত্রায়। মানুষ কিভাবে

বাঁচে সময় কীভাবে কাটায় তার মধ্যেই সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার সাহিত্যিক জীবন' যদিও সেটা স্কুলজীবন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ তবু তারই মধ্যে পরবর্তীকালের শহীদুল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। উত্তরজীবনে তিনি যা হয়েছেন তার প্রস্তুতি তাঁর শৈশবকাল থেকে শুরু। ভাষাতত্ত্ব চর্চা স্কুলে পড়তে পড়তে শুরু হয়েছিল। আরবী অনুলিখনের নিয়ম, প্রতিবর্ণীকরণ, সংস্কৃত ও ফারসীর তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ইত্যাদি তিনি তখন থেকেই ভাবনা চিন্তা করেছেন। সংস্কৃত ফারসী থেকে অনুবাদ, হিন্দী তামিল ভাষায় প্রবন্ধ তৈরি করার চেষ্টা ঐ স্কুলজীবন থেকেই শুরু। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মদন ভস্ম' হলেও তার আগে অনেক লেখা মক্স করেছিলেন। ফরাসী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ Les chants Mystiques de Kanha et de Saraha প্যারিস থেকে বেরোয় ১৯২৮ সালে। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানপার গীত ও দোহা' (১৯২৫) তারপর 'ভাষা ও সাহিত্য' বেরোয় ১৯৩১ সালে। ষাট বছরের অধিকাল ইংরেজি, ফরাসী উর্দু ও বাংলা ভাষায় ভাষা ও সাহিত্যের নানা দিক ইসলামী তত্ত্ব নিয়ে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন। তবে বার আনা লেখা বাংলা ভাষায়, তিনি বাংলা ভাষার লেখক ও মাতৃভাষার সেবক। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য-সাধনা মূলত তিনটি ধারার সমবায়ে গড়ে উঠেছে বাংলা সংস্কৃতি, ইসলামী ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্র তথা আধুনিক ঐতিহ্য।

ভাষাতাত্ত্বিকরূপে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ওকালতি করতে করতে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় যেমন 'বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা' (১৩২৫, ১ম সংখ্যা) 'আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' (১৩২৫, ৪র্থ সং) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর Outlines of the Historical Grammar of Bengali Language (Journal of the Dept. of Letters C. U. 1920), Magadhi Prakrit and Bengali (Indian Historical Quarterly Sept 1926) Munda Affinities of Bengali (Oriental Conference 1931), A Brief History of the Bengali Language (Dacca University Journal vol VII, 1923) প্রবন্ধগুলি বিদ্বৎসমাজে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয় এবং ভাষাতত্ত্বের ওপর নতুন আলোকপাত করে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে উভয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য যেমন দেখিয়েছেন তেমনি বাংলা ভাষায় শুধু বাক-ভঙ্গিতেই নয় প্রাত্যহিক প্রয়োজনে কোন্ কোন্ শব্দ কিভাবে এসেছে তাও দেখিয়েছেন। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ৩৭ বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান কালের উত্তমপুরুষের ব্যবহার' একবচনে ও বহুবচনে কিভাবে হয় তা দেখিয়েছেন। যেমন 'করোঁ' ও 'করী' পদ দুটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে বের করে দেখালেন 'মো করোঁ' মানে আমি করি, 'আম্মে করী'

অর্থাৎ আমরা করি। সুনীতিকুমার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই আবিষ্কার সানন্দে স্বীকার করেছেন, "The forms for the first person in NB, dialectal <calo> = Standard <cali> (for both singular and plural), have different origins which was first pointed out by Dr. Muhammad Shahidullah.' (ODBL vol 3, p 94) 'The first Aryan Colonization of Ceylon' প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্ বিজয় সিংহকে বাঙালীরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। ড. গাইগার ও সুনীতিকুমারের মতে তিনি গুজরাতি। সিংহলবাসীরা শহীদুল্লাহ্‌র মতকেই সমর্থন করেন এবং তাঁর প্রবন্ধটি শ্রীলঙ্কা সাহিত্যমণ্ডল সিংহলীভাষায় অনুবাদ করে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। সিংহলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে Origin of the Sinhalese Language নামে তিনি এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন সেটি Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society-র vol VIII 1962 সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সিংহলী পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করে। Linguistic Survey of India গ্রন্থের কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন। পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনী সভাপতির ভাষণে (১৩৪৫ : ১৯৩৮) এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, "Sir George Grierson-এর অধ্যক্ষতায় বাঙ্গালা সমেত সমস্ত ভারতবর্ষের সভ্য অসভ্য সকল ভাষার ও বুলির নমুনা Linguistic Survey of India নামক বিরাট গ্রন্থমালায় সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমার নিকট কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা বুলির সংগ্রহ বৈজ্ঞানিকরূপে হয় নাই বলিয়াই মনে হইয়াছে। আমাদিগকে এই কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। বুলির বৈজ্ঞানিক জরিপের জন্য জানা প্রয়োজন কোথায় কোন বুলির আরম্ভ এবং কোথায় তাহার শেষ। যেমন ধরুন কলিকাতা হইতে বরাবর উত্তর-পূর্বে আসিতে আসিতে কোথায় আমাদের, তোমাদের ইত্যাদি শব্দরূপ শেষ হইয়া আমাগো, তোমাগো হইল ; কোথায় বা আমাগো, তোমাগো শেষ হইয়া আমারগো, তোমারগো হইল, কোথায় বা আমারগোর, তোমারগোর হইল, কোথায় বা আমরার, তোমরার হইল, কোথায় আঁরার, তোঁরার হইল ; ভাষাতত্ত্বের জন্য এই সমস্ত বুলির একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দী জানা প্রয়োজন। ইউরোপের কোন কোন দেশে এইরূপ বুলির জরিপ হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহার আবশ্যকতা আছে।" ১৯২২ সালে Indian Autiquary-তে গ্রীয়ারসনের Reconstruction of the Apabhramsa Stabakas of Ramasarman প্রবন্ধের সমালোচনা করে তিনি ঐ কাগজেই The Apabhramsa Stabakas Ramasarman: a few suggestions প্রকাশ করেন (vol LVI, 1927, p 224) গ্রীয়ারসন তাঁর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নেন।

শহীদুল্লাহ্ আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি যাবতীয় আলোচনা পুরনো ভঙ্গিতেই করেছেন অর্থাৎ আলোচনা প্রধানত তুলনামূলক ইতিহাসভিত্তিক ও বর্ণনামূলক ছিল। ভাষার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে

ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়েছে, মূলভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়েছে শাখা প্রশাখাগুলি বর্ধিত হলেও পরস্পর পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করেছে আবার মূল ভাষাকেও তেমনি প্রভাবিত করেছে। ক্ল্যাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য একাধিক ভাষা শিখেছেন আর বর্ণনাভিত্তিক করতে গিয়ে ভাষা বিজ্ঞানের তত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাকরণ গভীরভাবে রপ্ত করেছেন। এজন্য তাঁর পক্ষে লুপ্ত শব্দগুলির পুনর্গঠন ও শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯) গ্রন্থে বাংলা ভাষা বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। সন তারিখ দিয়ে ভাষার জন্ম চিহ্নিত করা যায় না। তিনি প্রথমেই বলেছেন, "ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম।" (পৃ ১১, ১৯৬৫) বাংলাভাষার উদ্ভব সম্পর্কে গ্রীয়ারসন, হোর্নেল ও সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। এ বি কীথ প্রমুখ পণ্ডিতরা শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতকে সমর্থন করেন। দেশ ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন বাংলা ভাষার পূর্বে ছিল গৌড় অপভ্রংশ, তার পূর্বে ছিল গৌড়ী প্রাকৃত আর তারও আগে ছিল প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত যার থেকে প্রাচীন সিংহলী ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতের পূর্বে ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা বা আদিম প্রাকৃত। তিনি মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী অপভ্রংশে' নির্দেশ করেছেন। ড সুনীতিকুমারের মতে অপভ্রংশ যুগের সময় কাল ৬০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে ৬৫০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসিভাষায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থেও অপভ্রংশ ভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাংলা ভাষায় অনার্য মুণ্ডা ও বৈদেশিক প্রভাব সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। শুধু বাংলা নয় উর্দু হিন্দী, আরবী, ফারসি, সংস্কৃত পুশতু, সিংহলী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের বিস্তৃত আলোচনা ইংরেজি ও বাংলা ভাষাতে করেছেন এবং তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধও লিখেছেন যেমন 'হৈহয় কুলের শার্যাত শাখা' 'প্রথম মহীপাল দেব ও শ্রীরল' 'Gopal Deva I of Bengal' The Ancient Indus valley people' ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি —পত্র-পত্রিকায় পড়ে আছে।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার উল্লেখযোগ্য অবদান বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বানান ও বর্ণমালা সংস্কার। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রকাশিত হয়, সুনীতিকুমারের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। ভূমিকায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন, "আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষাশিক্ষার্থী

উভয় শ্রেণীর জন্য রচিত। এই জন্য যেমন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে।" বাংলা ব্যাকরণের নিয়মাবলীর পাশে পাশে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়েছেন কেননা সংস্কৃতের কাছেই বাংলার ঋণ সর্বাধিক। বাংলা ব্যাকরণের বিষয়গুলিকে তিনি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা ধ্বনি প্রকরণ (Phonology), শব্দ প্রকরণ (Accidence), বাক্যপ্রকরণ (Syntex), ছন্দপ্রকরণ (Prosody) ও অলংকার প্রকরণ (Rhetoric)। এই ব্যাকরণটি তাঁর বহু বর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার উজ্জ্বল স্বাক্ষার। বাংলা বানান সমস্যা ও বর্ণলিপি সংস্কার নিয়েও তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন। 'কোহিনুর' 'প্রতিভা' 'প্রবাসী' 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা'য় তার উদাহরণ আছে। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি এক বানানবিধি প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ বানানবিধির কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে এবং কোন্ কোন্ স্থলে যুক্তিকে বর্জন করে খেয়ালপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও লিপি ও বানান সংস্কারের একটি বিধি রচনা করেছিলেন যেটি বাংলা একাডেমি পত্রিকার পৌষ-চৈত্র ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষায় ধ্বনি ও সংস্কার' প্রবন্ধে এবং 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯) গ্রন্থে পাওয়া যাবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তিনি যুক্তাক্ষর বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর 'সোজা বাংলা'র প্রস্তাব ছিল স্বরবর্ণ অ-মাতৃক হলে স্বরবর্ণে নতুন অক্ষর অ্যা থাকবে, দীর্ঘস্বর থাকবে না।

অভিধান রচনার কাজ বিরক্তিকর ও দারুণ পরিশ্রমের কাজ। সেজন্য উইলিয়াম কেরীর সহযোগী জন ক্লার্ক মার্শম্যান একবার বলেছিলেন, কাউকে যদি দণ্ড দিতে হয় তাহলে তাকে অভিধান রচনার কাজে নিযুক্ত কর কেননা অভিধান রচনা করার মত নিরানন্দ কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। শহীদুল্লাহ্ সাহেব অভিধান রচনার কাজে আনন্দ পান। ১৩২৩ নৈবেদ্য পত্রিকায় 'বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ' প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, "বাঙ্গালা অভিধান আমোদের অফুরন্ত খনি। একজন শুভদর্শী (Optimist) তাহাতে সুখশান্তি সৌভাগ্য সৌন্দর্য পুণ্য আনন্দ সকলই দেখিতে পাইয়া অতুল আনন্দনীরে ভাসিবেন। একজন শাব্দিক (Philologist) তাহাতে আপনার প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র দেখিয়া উল্লাসে মাতিবেন।" অভিধান শুধু শব্দের তালিকা বা অর্থমালা নয় একটা জাতির সামাজিক ইতিহাসও কারণ বিভিন্ন শব্দের অর্থ বিভিন্ন যুগে কিভাবে সঙ্কুচিত হয় সম্প্রসারিত হয় পরিবর্তিত হয় তা বোঝা যায় তাই শব্দবিদের কাছে অভিধান হচ্ছে আনন্দের খনি। স্বাভাবিকভাবেই শহীদুল্লাহ্ সাহেব অভিধান রচনার কাজে যে আনন্দ পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অভিধান কিভাবে এবং কী পদ্ধতিতে সংকলিত হবে তারও একটি নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন প্রবন্ধে।. বাংলা শব্দ সমষ্টিকে তিনি ছয় ভাগে ভাগ করেছেন (১) সংস্কৃত-

রূপ শব্দ (যেমন ভিক্ষা উচ্চারণ ভিকথা, ভিকখে ভিক্কে) (২) সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন শব্দ (যেমন কর্ণ > কান) (৩) বৈদেশিক শব্দ (যেমন কাগজ ফারসী কাগয) (৪) বৈদেশিক শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন শব্দ (যেমন তাগাদা আরবী তাকাযা), (৫) কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়নি এমন শব্দ (যেমন কালা হাবা) (৬) বৈদেশিক শব্দে বাংলার কৃৎ বা তদ্ধিত বিভক্তি যোগ করে শব্দ (যেমন মুরগী ফারসি মুরগ)। শব্দার্থের দিক দিয়ে ভাগ করেছেন—একার্থক শব্দ ও শব্দের একাধিক অর্থ। একার্থক শব্দ যেমন জল; শব্দের একাধিক অর্থ যেমন চাল ক. ঘরের আচ্ছাদন খ তণ্ডুল গ. ধাপ্পা দেওয়া। শব্দের আবার প্রতিশব্দ যেমন জল=পানি, লজ্জা=সরম। এই প্রতিশব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজে ব্যবহার হয়। যেমন যারা পানি বলে তারা জল বলে না, যারা জল বলে তারা পানি বলে না। শব্দার্থের সংকোচ (যেমন নিকাহ্ আরবী অর্থ বিবাহ, বাংলায় নিকা অর্থ মুসলমানদের বিধবা বিবাহ) অর্থের বিস্তৃতি (যেমন কালি লেখবার উপকরণ, অর্থ কাল তরল বর্ণ কিন্তু 'লাল কালি' বললে লাল রংয়ের কালি বোঝায়) ইত্যাদি বলেছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে বাংলা ভাষায় আরবী ফারসি শব্দ প্রায় ২000 অর্থাৎ শতকরা ৮ ভাগ কিন্তু ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী (১৮৯৯-১৯৬১) Persc-Arabic Elements in Bengali (বাঙলার ফারসী আরবী উপাদান, জানুয়ারী ১৯৬৭) অভিধানে ৫১৮৬ টি আরবী ফারসী শব্দ বাংলায় দেখিয়েছেন।

বাংলা ভাষার প্রকৃত অভিধান আজও রচিত হয়নি যা আছে তা শব্দার্থ অভিধান --সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক উপভাষার সম্যক পরিচয়, শব্দের উৎপত্তি, উচ্চারণমূলক অর্থের প্রকার ভেদ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দেশমূলক অভিধানের একান্ত অভাব। সুনীতিকুমারের ভাষায় বলা যায় বাংলা উপভাষাগুলি জানা না থাকলে বাংলা ভাষার সামগ্রিকরূপে ধরা পড়ে না। তাই প্রথম থেকেই একটি আদর্শ অভিধান প্রণয়নের জন্য আন্দোলন প্রধানত শহীদুল্লাহ শুরু করেন। ১৯২০ সালে চন্দননগরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে ছাত্র সম্মিলনীতে তাবৎ দেশবাসীর কাছে Oxford English Dictionary, English Dialect Dictionary-র অনুকরণে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান প্রণয়নের জন্য শব্দ সংগ্রহ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিংবদন্তী, ছড়া, উপকথা, রূপকথা, হেঁয়ালি, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি সংগ্রহ করতেও বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আবেদন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়। ১৩৪৫-এ পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও তিনি লোককাহিনী ছড়া রূপকথা ইত্যাদি সংগ্রহের কথা বলেছিলেন। ভাষণটি এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে বিভিন্ন কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনও প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সবই বিফল হয়। রবীন্দ্রনাথও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বলেছিলেন, "দেশী ভাষায় ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান

সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।" কাজের কাজ কিছু হয় নি।

আমাদের দেশে আঞ্চলিক ভাষা সংকলনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৭৩৪ সালে। পর্তুগীজ পাদরী মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ Vocabulario Em Idioma Bengalla (1743)-তে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার কিছু আঞ্চলিক শব্দ সংকলিত করেন। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড. (১৭৫১-১৮৩০) পূর্ববঙ্গে মুনশীদের সাহায্যে বাংলা ও ফারসী শব্দ যা চয়ন করেছিলেন তা প্রধানত ঐ অঞ্চলের ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ ছিল। এরপরই স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন যে LSI প্রকাশ করেন (১৯০৩-১৯২৮) তার মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দের সুবৃহৎ সংকলন ছিল। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এফ. ই. পার্জিটার রচিত 'Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Words' নামে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশিত হয় (১৯২৩)। শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নের কথা বলেছিলেন এগুলি সেই প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়নি। গ্রীয়ারসনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখকে নিয়ে একটি শব্দ সমিতি গঠন করেন—কাজ খুব ঢিমেতালে চলেছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাঁরা যাঁরা অবসর সময়ে কিংবা খেয়ালখুশিমত শব্দ সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সংগৃহীত শব্দাবলী সময় সময় পরিষৎ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তার একটি তালিকা বর্ষ ও সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হল—

ঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ—গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ (বরিশাল জেলায় প্রচলিত) (১৩০৯/২)
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা (১৩১২ ১)
রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার—ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা (১৩১২ ৪)
রাজকুমার কাব্যভূষণ—গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ (১৩১৪ ৪)
সত্যসুন্দর বসু—কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ (১৩১৫ ৪)
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য—যশোহরের গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ (১৩১৫/২)
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বাঙ্গালা ভাষা রাঢ়ের ভাষা (১৩১৫ অতিরিক্ত)
পরমেশ প্রসন্ন রায়—ঢাকার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ (১৩১৬ ২)
দেবেন্দ্রনাথ বসু—নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ (১৩১৬ ৪)
হরিদাস পালিত—মালদহের পল্লীভাষা (১৩৮১/৩)
অম্বিকাচরণ গুপ্ত—কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য (১৩১৮ ৪)
কৃষ্ণনাথ সেন—ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান (১৩১৯/৪)

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ (১৩১৯/৪)
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার গ্রাম্যশব্দ (১৩১৯/৪)
হরিনাথ ঘোষ— মানভূম জেলার গ্রাম্যভাষা (১৩২১/১)
রাখালরাজ রায়—জঙ্গিপুরের (মুর্শিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ (১৩২২/৩)
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা (১৩২৬ ২)
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—খুলনা জেলার মাঝির ভাষা (১৩৩১ ২)
গৌরীহর মিত্র—বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ (১৩৩৪ ২)
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ (১৩৩৪/৪)
কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী—শ্রীহট্টজেলার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ (১৩৩৭/৩)

বাংলা উপভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার প্রমুখ। যোগেশচন্দ্র রায় 'বাঙ্গালা শব্দকোষে' রাঢ় অঞ্চলের অনেক শব্দ দিয়েছেন। রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ স্থান পেয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক শব্দের অভিধান বাংলা সাহিত্যে ছিল না। এই অভাব পূরণ করেছে 'পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থটি। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ২৪ পরগণা অঞ্চলের উপভাষায় একটি সমীক্ষা করেছিলেন সেটি পরিষৎ পত্রিকার ১৩৫১ বর্ষের ১-২ সংখ্যায় 'জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা' নামে প্রকাশিত হয় (পৃ ৩৮-৪০)। লোক সাহিত্য কিংবা আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের প্রচেষ্টা আশানুরূপ না হওয়ায় শেষে শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মধ্যে 'লোকসাহিত্য সংগ্রহ সমিতি' গড়েছিলেন। কাজ বিশেষ কিছু এগোয় নি। তাঁর স্বপ্ন সফল হল দেশভাগের পর—বাংলা একাডেমি লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ অভিধান প্রণয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রথম প্রকল্প আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় প্রকল্প ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর সংকলন, তৃতীয় প্রকল্প বাংলা সাহিত্যকোষ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত বিশেষার্থক শব্দ প্রবাদ, উপমা, রূপক, ধাঁধা, কোটেশন ও মুসলমান সাহিত্যসাধকদের জীবনী।

আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে ক. মুক্ত পদ্ধতি (Open System) খ. বদ্ধপদ্ধতি (Close System)। মুক্ত পদ্ধতি কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংগ্রাহক নয়, যে কোন লোক স্বাধীনভাবে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করে পাঠাতে পারেন তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষিত হয়ে সংকলিত হয়। বদ্ধপদ্ধতি হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা নিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগ্রাহকদল বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে শব্দ সংগ্রহ করেন। 'পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (বর্তমান নাম বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান)-এ প্রধানত মুক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। এখানে

কোনো পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয় নি। English Dialect Dictionary সংকলনে প্রায় তিনশ স্বেচ্ছা-সাহিত্যসেবক নিযুক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে কোন সাহিত্যসেবক নিযুক্ত করা হয়নি। কিভাবে শব্দাবলী সংগৃহীত হয়েছে তার একটি বিবরণ বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানতে পারি যে এই প্রকল্প ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, শব্দ সংগ্রহ ১৯৬০ সালে শেষ হয় তারপর সংকলনের আসল কাজ শুরু হয় ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে। শব্দসংগ্রহ করার জন্য বাংলা একাডেমি প্রথমে একটি ফরম ছাপান। ফরমটি ছিল নিম্নরূপ—

SL. No	Word	Meaning of the Word	Locality of the District where it is used	Use with local implication i. e. examples showing the uses of the word in the locality	Different phonetic representations with name and locality i. e different pronounciation of the word according to spelling	Derivation if possibal	Special remarks if any, about the word
1	2	3	4	5	6	7	8

প্রথমের দিকে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। ৯৬ জন সংগ্রাহক মাত্র ২১000 শব্দ পাঠান। ফলে ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণের নিকট শব্দ পাঠাবার জন্য আবেদন করা হয় এবং আবেদনের ফলে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ৪৫৩ জন সংগ্রাহক তিন বছরে ৭৫১ টি কিস্তীতে মোট ১,৬৬,২৪৬ টি আঞ্চলিক শব্দ পাঠান। সংগ্রহের দরুণ পারিশ্রমিক বাবদ ২২,৬৮৬ টাকা সংগ্রাহককে দেওয়া হয়। জীবিকা অনুসারে সংগ্রাহকদের এইভাবে ভাগ করা হয়েছে—

মোট সংগ্রাহক সংখ্যার অর্ধাংশ—অধ্যাপক ও শিক্ষক

" " " এক চতুর্থাংশ—ছাত্র

" " " " —বিভিন্ন কর্মজীবী

জেলাওয়ারী সংগ্রাহকদের সংখ্যাও তাঁরা দিয়েছেন—

ঢাকা ১১৪, পাবনা ৩১, সিলেট ৩০, চট্টগ্রাম ২৪, রাজশাহী ৪২, ফরিদপুর ২০, রংপুর ১৭, যশোহর ১৩, ময়মনসিংহ ৪১, বাখেরগঞ্জ ১২, বগুড়া ৯ কুষ্ঠিয়া ৮, দিনাজপুর ৬, কুমিল্লা ৪0, নোয়াখালী ৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম ১, খুলনা ৩৯, করাচী ১ মোট ৪৫৩ জন।

জেলাওয়ারী সংগ্রাহকদের সংখ্যার পরিমাণ বলেছেন কিন্তু যেটা খুব জরুরী বিষয় সেটি হোল কতজন সংগ্রাহক গ্রামে থাকেন কতজন শহরে থাকেন তাঁদের জীবিকা কি একথা বলা হয়নি কারণ আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহ করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণীর

জীবিকার লোকেরও প্রয়োজন হয় এই চিত্রটা থাকলে ভাল হত। শব্দ সংগৃহীত হবার পর শব্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে সম্পাদক করে একটি উপদেষ্টা সংঘ গঠিত হয়। উপদেষ্টা সংঘের সদস্য ছিলেন ড মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও মুনীর চৌধুরী। সংগ্রাহকরা যা শব্দ পাঠিয়েছেন নির্বিচারে তা গ্রহণ করা হয়নি। সতেরোটি আলোচনা সভার মাধ্যমে উপদেষ্টা সংঘ প্রতিটি আঞ্চলিক শব্দ বিচার করে গ্রন্থভুক্ত করেছেন। প্রায় ৭৫ হাজার শব্দ অভিধানে স্থান পেয়েছে। কোন্ কোন্ কারণে শব্দ বর্জিত হয়েছে তাও নির্দেশ করা হয়েছে—

ক. সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত বাংলা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত অনেক শব্দ সংগ্রাহকগণ পাঠাইয়াছেন।

খ অনেকে আঞ্চলিক শব্দের অর্থ যথাযথ লিখিতে পারেন নাই। প্রয়োগের সঙ্গে সংগ্রাহক প্রদত্ত অর্থের বৈষম্যও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে।

গ. বহুল প্রচলিত অনেক আঞ্চলিক শব্দই সংগ্রাহকগণ প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ পঞ্চাশ জন সংগ্রাহকের দ্বারাও প্রেরিত হইয়াছে।

ঘ দুই একজন সংগ্রাহক হয়ত নিজেরাই শব্দ তৈরী করিয়া আঞ্চলিক শব্দ বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ঙ. একই শব্দসমষ্টি বিভিন্ন নামেও প্রেরিত হইয়াছে।

চ. কোন কোন ক্ষেত্রে সংগ্রাহকের হস্তাক্ষর খুবই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল।

কোন্ রীতিতে শব্দ গ্রহণ করা হবে তাও আলোচনা করে স্থিরীকৃত হয়। প্রধানত ধ্বনি, বর্ণ, বানান, শব্দ ও অর্থ অভিধানটির মধ্যে যাতে থাকে সেদিকে উপসংঘ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তবে শব্দ গ্রহণ বর্জন ও বিন্যাসের যে রীতি অভিধানে অনুসৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু কথা থেকে যায়। সংগ্রাহকরা শব্দের সঠিক অর্থ দিতে অপারগ হওয়ায় শব্দটা বর্জিত হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি শব্দটা খাঁটি হয় তার সঠিক অর্থ সংগ্রাহকরা না দিলেও উপসঙ্ঘের তরফ থেকে সঠিক অর্থ নির্দেশ করা উচিত ছিল। বিন্যাসের যে নীতি অবলম্বিত হয়েছে সে-সম্পর্কে বলা যায় ধ্বনিগত দিক দিয়ে কয়েকটি জেলায় চন্দ্রবিন্দু রাখা হয়েছে বাকী জেলা-গুলিতে বর্জিত হয়েছে কিন্তু যে জেলাগুলিতে চন্দ্রবিন্দু বাদ পড়েছে সবক্ষেত্রে কি চন্দ্রবিন্দু অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে ?

শহীদুল্লাহ্ সাহেব অভিধানের প্রারম্ভে যে ভূমিকা লিখেছেন সেটি অত্যন্ত মূল্যবান। ভূমিকায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে আলোচনার আগে পূর্ববঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার একটি পৃথক অস্তিত্ব কিভাবে গড়ে উঠেছিল সেটি প্রথমে বলেছেন। গ্রীয়ারসন উপভাষাসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তাঁর কোন কোন শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেব ভিন্নমত পোষণ করলেও

মোটামুটি তাঁর শ্রেণীবিন্যাসকে মেনে নিয়ে আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছেন। রাজবংশী ও রংপুরী ভাষাকে গ্রীয়ারসন পাশ্চাত্য বিভাগের একটি প্রশাখারূপে উল্লেখ করেছেন, শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাকে উদীচ্য শাখার প্রশাখা বলতে চান। নোয়াখালির উপভাষাকে তিনি পূর্বদেশী শাখার মধ্যে রাখতে চান, হাজং চাকমা প্রভৃতি ভাষাকে জাতিগত প্রশাখারূপে তিনি আনতে চান না। বাংলা সাধুভাষা বিভিন্ন উপভাষায় কিভাবে রূপান্তর হয় তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। অভিধানের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়। শহীদুল্লাহ্ সাহেব গ্রন্থভুক্ত যাবতীয় আঞ্চলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন পরীক্ষা করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর মতো শব্দবিদ খুব কম জনই আছেন।

পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের স্বরবর্ণ অংশ অ থেকে অনদূর নমুনা হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮০, তিন কলমে ছাপা। ১৯৬৫ শেষের দিকে অভিধানটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয় তিন কলমে ছাপা রয়াল অক্টেভো সাইজ (২৮ × ২২ cm)। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানী নামটি বর্জিত হয়ে 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধান' নামে প্রকাশিত হয়—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা [৩০] + ১০৫৮। ভাষার প্রাণ প্রবাহ রয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় –বাংলাদেশের মানুষ একথাটি কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তা ভাষার অভিধান প্রণয়নের মধ্যেই পাওয়া যায়।

১৯৫৯ সালে শহীদুল্লাহ্ সাহেব করাচীর উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উর্দু অভিধান, ১৯৫৮ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমির উদ্যোগে ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা করেছিলেন। উর্দু অভিধান বেরিয়েছে কিনা আমার জানা নেই তবে ইসলামী বিশ্বকোষ (জুন ১৯৮২) বেরিয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে নয় ইসলামিক ফাউণ্ডেসন থেকে। লাইডেন থেকে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam অনুবাদের সিদ্ধান্ত বাংলা একাডেমি গ্রহণ করেন এবং শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে সম্পাদক করে নয়জন সদস্যকে নিয়ে উপসঙ্ঘ গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে সম্পাদন দায়িত্ব শেষ হয়। পাণ্ডুলিপিতে ছিল মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ তার মধ্যে Shorter Encyclopaedia of Islam-এর ৫০৮ টি নিবন্ধের অনুবাদ ছিল, ১১১ টি নিবন্ধের সংশোধনসহ অনুবাদ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষের (দাইরা-ই-মা 'আরিফ-ই-ইসলামিয়া) ৩৭ টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং মৌলিক নিবন্ধ ৩৫ টি। বাংলা একাডেমি এই বিশ্বকোষ প্রকাশে অপারগ হওয়ায় ইসলামিক ফাউণ্ডেসনের কাছে পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেসন নতুন করে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেন, সংশোধন করেন, কিছু বর্জন করেন, কিছু সংযোজন করেন এবং সম্পাদন-পরিষদ নতুন করে গঠন করেন। গ্রন্থটি 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' নামে দু খণ্ডে প্রকাশিত হয় - পৃষ্ঠা সংখ্যা [৪৪] + ১০৭৬, সাইজ রয়াল অক্টোভো (২৮ × ২২ cm)। গ্রন্থের ভূমিকায় যেখানে নিবন্ধকার ও অনুবাদক-

বন্ধের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নাম আছে কিন্তু বিষয়ের [illegible] নিবন্ধকার বা অনুবাদকের নাম না থাকায় কোন্‌টি কার রচনা কিংবা [illegible] তা বোঝার উপায় নেই। অভিধান বিশ্বকোষ যদিও বহুজনের সেবায় ও শ্রমে গঠিত তবু জীবনের শেষ সীমায় এসে এরূপ একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নেতৃত্ব দান শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জ্ঞানপিপাসার অন্যতম স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যের ভাষা কী হবে এবং কেমন হবে তাও তিনি বলেছেন। সংস্কৃত আরবী ফারসি শব্দ বহুল বাংলায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন সহজ সরল ভাষা। তিনি 'এ সম্পর্কে বলেছেন, "এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বল্‌তে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে-শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্যদিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী উর্দু-বাংলার এক অপূর্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব-বীর্য-সূর্য নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মরু পরি গঞ্জি মজ্জমণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্যনিচয়সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হস্তকর-পতিত-রজনিকর যোদ্ধনিকর উড়ু বৃন্দে।

২ নম্বর

জাহান আলম বাদশা তক্তের উপরে।
সুখেতে বাদশাই করে খোসাল্ অন্তরে॥
সাত মুল্লুকের বাদশা জাহান আলম।
কেত্তা সরঞ্জাম তার আল্লাকে মালুম॥

এ দুদলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হ'লে বাংলা মরে ভূত হয়ে যাবে—একটা নয় দুটো। একটা ব্রহ্মদৈত্য, আর একটা মামদো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।" ('মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, ঢাকা ১৩৩৫) শহীদুল্লাহ্ সাহেব সারাজীবন সরল বাংলায় লিখেছেন। ভাষা সরল করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা সংস্কারের প্রশ্ন এসে পড়েছে। বানান ও অক্ষর সংস্কারের কথা তিনি বহু প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন একথা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনি কয়েকটি মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন যা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করে নিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ও কালনির্ণয়ের প্রামাণিকতা ও অধিকার সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। চর্যাপদ সম্পর্কে তাঁর নিজের

কৌতূহল এমনই ছিল যা জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও ক্লান্ত হয়নি। [illegible] বিদ্যালয়ের সিলেবাসে তিনি প্রথম চর্যাপদকে পাঠ্য করেছিলেন [illegible] করতেন চর্যাপদের সময় থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। সুনীতি-কুমারের মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভাষা কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে প্রাচীন বঙ্গ কামরূপী ভাষা। চর্যাপদ রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে যে রায় তিনি দিয়েছেন তার সঙ্গে সকলে একমত হননি তবে উপেক্ষাও করতে পারেন নি। চর্যাপদের ওপর তিনি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' 'প্রতিভা' এবং 'সাহিত্য পত্রিকায়' বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ফরাসিভাষায় চর্যাপদের আলোচনা করেছিলেন 'লে শাঁ মিস্তিক দ্য কান্‌হ এ দ্য সরহ' অর্থাৎ 'কাহ্ন ও সরহের মরমী পদাবলী' গ্রন্থ প্যারিস সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীর গবেষণা পত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পর চর্যাপদের বৈজ্ঞানিক পাঠ নির্ণয় তিনি করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই পাঠ নির্ণয়ে কিছু ভ্রান্তি আবিস্কৃত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ আবিস্কাব কবেন এবং তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে চর্যাগীতির পাঠ প্রস্তুত করেন। এবং ঐ পাঠ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters এ 'Materials for a Critical edition of the old Bengali Carya padas' নামে প্রকাশিত হয়। পরে পরিমার্জন করে শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে 'Caryagiti-kosa of Buddhist Siddhas' ১৯৫৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাহ্ন ও সরহের শুধু তিব্বতী পাঠ শহীদুল্লাহ্ সাহেব দিয়েছিলেন। চর্যাগীতির পুরো তিব্বতী অনুবাদ বেরুবার পরও তাঁর কাজের মূল্য কমেনি শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী ভূমিকায় বলেছেন···in an admirable work Les chants Mystiques de kanha et de Saraha, Dr. M. Shahidullah has compared the Apabhromsa verses with their Tibetan translation, settled their meaning and made a detailed study of their lannguage". ইংরেজি ভাষাতেও ১৯৪০ সালে Dacca University Studies-এর ৪র্থ বর্ষের একাদশ সংখ্যায় তাঁর Buddhist Mystic Songs বেরোয় তারপর গ্রন্থাকারে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে চর্যাপদের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং প্রতিটি পদের শব্দার্থ ও উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থের প্রথম দিকে দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তিব্বতী ভাষার সাহায্যে চর্যাপদ রচয়িতার জীবনী ও পদরচনার কালনির্ণয় যেমন করেছেন তেমনি পদগুলির ভাষাগত শব্দবিচার, ব্যাকরণ ছন্দ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। চর্যাপদে সমাজচিত্র এবং কিভাবে ধর্ম সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তার কথা [illegible] বলেছেন, "their value in the history of religion in Eastern India and in the history of the Eastern branch of the New Indo-Aryan languages, they were the source of the later Sanskrit [illegible], the Bengali Vaishnava songs in one hand and in the other [illegible] ghazals." (PXXIX,

1966) চর্যাপদ আবিষ্কারের কৃতিত্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কিন্তু নানাদিক থেকে বিচার করে তাকে প্রাণদান করেছেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব। সুনীতিকুমার তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "The only valuable article is by Moulvi Md. Shahidullah …offers very satisfactory readings of some obscure passages and on the whole is extremely helpful and suggestive" (ODBL Part I)

তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক সমস্যার গ্রন্থিমোচন করেছেন। যেমন চণ্ডীদাস সমস্যা। চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যে তিনজন ছিলেন বড়ু, দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাস। ধর্মঠাকুরকে তিনি বৌদ্ধ বলে মনে করেন। মীননাথকে তিনি বাংলা ভাষার আদিম লেখক এবং সহজযান মতের প্রবর্তক বলে মনে করেন। দুজন বিদ্যাপতি মিথিলা ও বাঙ্গালি বিদ্যাপতি। কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের কবি হলেও তাঁর জীবৎকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে তাঁর জীবৎকাল ১৩৯০ থেকে ১৪৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। শেখ ফয়জুল্লাহকেই গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা হিসেবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন করেন। এই জাতীয় সমস্যার সমাধান তিনি দুখণ্ডে রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৯৫৩, ১৯৬৪) গ্রন্থে দিয়েছেন—এটি কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিকরা যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেননি বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্যে মুসলমান কবিদের অবদান সম্পর্কে যেখানে তাঁরা নীরব থেকেছেন সেখানে শহীদুল্লাহ্ সাহেব দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ ছিল তার পরিচয়ও দুখণ্ডে 'বাংলা সাহিত্যের কথার মধ্যে আছে। Traditional Culture in East Pakistan (1963) গ্রন্থেও লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত লোকশিল্প এবং লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা আছে।

তিনি আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত করেন। বিদ্বৎসমাজের অনেকেই এই সংস্করণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'পদ্মাবতী'র পুথি একমাত্র আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে ছিল—তিনি ৩৯ টি পুথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে 'পদ্মাবতী' প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপির অর্ধাংশের ওপর হারিয়ে যায়, প্রথমাংশটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৭৭)। আলাওলের মূল 'পদ্মাবতী' এ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেননি—সব ঐতিহাসিকরা পরের মুখে ঝাল খেয়ে বেড়িয়েছেন। 'হবিবী প্রেস' থেকে মুদ্রিত 'পদ্মাবতী' বাজারে চালু ছিল। বহুদিন ধরে 'পদ্মাবতী'র একটি বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাব ছিল, একাজে কেউই এগিয়ে আসেন নি। শহীদুল্লাহ্ সাহেবই প্রথম 'পদ্মাবতী'-র একটা মুদ্রিত নির্ভুলরূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বাজার চলতি সংস্করণের সঙ্গে হিন্দির পাঠ মিলিয়ে তিনি 'পদ্মাবতী' খাড়া করেছিলেন (১৩৫৬)।

আলাওলের রচনাবলী সম্পাদনা করার একটি মনোগত বাসনা তাঁর ছিল।

নিবেদনপক্ষে বাংলা একাডেমি 'পদ্মাবতী' সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁকে দিক এরকম ইচ্ছা পোষণ করতেন। বাংলা একাডেমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা ও পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সভাপতির গুরুভার দিয়ে আর বেশি চাপ না দেওয়ার সংকল্প করে সেজন্য 'পদ্মাবতী' সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সৈয়দ আলী আহসানের ওপর। শহীদুল্লাহ্ সাহেব আলী আহসান সাহেবকে সম্পাদনার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, "গবেষণা কর্মে আমি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি, পদ্মাবতের কয়েকটি সংস্করণ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে গ্রিয়ার্সন সম্পাদিত, আর একটি হচ্ছে শিরেফ কর্তৃক ইংরাজি অনূদিত, আর একটি সৈয়দ কল্বে মোস্তাফার জায়সীর জীবনী। এই বই-গুলো তাঁর নিজস্ব পাঠাগারে ছিল। এই সহায়তার ক্ষেত্রে ডক্টর শহীদুল্লাহ্র একমাত্র তৃপ্তি ছিল আলাওলের কাব্যটি সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হোক।" (ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ স্মৃতিগত তাৎপর্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী ১৯৮৫, পৃ ৬৯-৭০)

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের 'পদ্মাবতী'র পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৩৭৬ সালে বেরোয়। এই সংস্করণে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সৌজন্যে দুটি পাণ্ডুলিপি এবং সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' পাঠের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'পদ্মাবতী'র বিশুদ্ধ ও আদর্শ সংস্করণ সাহিত্যবিশারদই প্রস্তুত করতে পারেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। ভূমিকায় তিনি কিভাবে পাঠ প্রস্তুত করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'ও সম্পূর্ণ নয়—রত্নসেনের সিংহল প্রবাস থেকে পদ্মাবতীর চিতোর প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। সম্পূর্ণ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বার্ধক্যবশত নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমার পরিকল্পিত সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা আমার পক্ষে আর সম্ভব হইল না।" (নিবেদন ১৩৭৬) পদ্মাবতী জায়সীর পদ্মাবতের অনুবাদ হলেও আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্খানে তা নির্দেশ করেছেন, "আলাওল প্রধানতঃ অনুবাদক সত্যই। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ মৌলিক রচনার স্পর্ধা করিতে পারে। কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টভাব তাঁহার রচনায় দেখা যায় না। এরূপ নিপুণ অনুবাদ কম প্রশংসার কথা নয়। সকলের চেয়ে আশ্চর্য হই আমরা এই মুসলমান কবির অনিন্দ্য সাধুভাষার প্রয়োগ দেখিয়া।"

(ভূমিকা, পৃঃ ৫।০, ১৩৭৬)

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার একটি পাঠান্তর (প্রবাসী ১৩৬৩), ভরত কন্দ ও বিশ্বামিত্র (প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৫৪), গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৬৪) গোত্রভিদ ইন্দ্র (নৈবেদ্য ১৩২২), কবির সাহেব ও হিন্দুধর্ম (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২৪)

প্রভৃতি। এরই সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বঙ্গ সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি সেজন্যে তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মিলনভূমি সাহিত্য। বঙ্গসংস্কৃতিতে হিন্দুর অবদান সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে সে তুলনায় মুসলমানদের অবদান তুলে ধরা হয় নি —তিনি সেই কাজ করেছেন। সেজন্যে সুনীতিকুমার মুসলমান বাঙ্গালীর আহৃত উপাদান নির্ণয় করার মধ্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রধান কৃতিত্ব নির্দেশ করেছেন। তিনি ইসলামী ঐতিহ্য ও সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালী মুসলমানকে তার পূর্ব গৌরব সম্পর্কে যেমন সচেতন করেছেন তেমনি হিন্দু সমাজে মুসলমানী ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণা আছে তাও নিরসন করেছেন। তাছাড়া উর্দু ভাষায় ইসলাম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় তার অভাব দেখে তিনি একদিকে অনুবাদ করেছেন অপরদিকে আলোচনামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব আরবী ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমানের অবদান সম্পর্কে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার কিয়দংশ গ্রন্থলগ্ন হয়েছে। ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৭০) শেষ নবীর সন্ধানে (১৯৬১), Essays on Islam (1945), Islam and Humanism (1979), নবী করিম হযরত মুহম্মদ (দঃ) (১৯৭৫) প্রভৃতি আলোচনা গ্রন্থ এবং অমিয়বাণী শতক (১৯৪১), অমর কাব্য (১৯৬৩), বাইঅতনামা (১৯৪৮), Pearls from the Holy Prophet (1970), মহাবাণী (১৯৪৫), বুখারী শরীফ, কুরআন শরীফ প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ এর নিদর্শন। এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে অপরদিকে বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে মুসলমান পিছিয়ে আছে কারণ শিক্ষার প্রসার মুসলমান সমাজে বেশী হয়নি, হিন্দু সমাজ সাহিত্যে অনেকদূর এগিয়ে আছে কারণ মুসলমান সমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজে শিক্ষার প্রসার বেশী হয়েছে এবং হিন্দু সমাজে শিক্ষার প্রতি আগ্রহও অনেকগুণ বেশী। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা আনতে হলে মুসলমান সমাজকে উন্নত হতে হবে। উঁচুনীচুর সঙ্গে মিল হয় না কাজেই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। সেজন্যে নিজেদের সাহিত্য অর্থাৎ মুসলিম সাহিত্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন। মুসলিম সাহিত্য বললেই হয়ত গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব মুসলিম সাহিত্য বলতে কী বোঝেন তা পরিষ্কার করে বলেছেন, "আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য। কেউ হয়ত বলতে পারেন কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জাতবিচার। তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার—মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি? বাংলা সাহিত্য আছে কিন্তু আমাদের সাহিত্য নেই। আমাদের ঘর ও বার, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের দৈন্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য

অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে।" (নিখিল ভারত মুসলিম যুবক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ১৯২৮) উৎসমূল হারিয়ে ফেললে জাতি তার বৈশিষ্ট্য তার চরিত্র হারিয়ে ফেলে সেজন্যে সাহিত্যের মধ্যে মুসলমান সমাজ যেন নিজের উৎসমূল খুঁজে পায় সেকথা তিনি বারবার বলেছেন, "সাহিত্য জাতির মনোভাবের ছাপ বয়। জাতির ভাবধারা তার কালচারের সৃষ্টি। কাজেই এক বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সাহিত্য এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। আমরা বাঙালী যেমন সত্য, তার থেকে বেশি সত্য আমরা মুসলমান। আমাদের একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংলা সাহিত্যে আমাদের সেই কৃষ্টির ছাপ না থাকে তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় সাহিত্যের মতই ঠেকবে।" (নেত্রকোনার মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণ ১৩৩৬) হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক বিরোধের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।" (পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ, ঢাকা ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮) এই কারণেই তিনি মুসলমানদের আরবী নামের সঙ্গে একটি করে বাঙালী নাম রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বুলবুল কার্তিক ১৩৪৪ সংখ্যায় 'এক জাতি গঠন' নামক প্রবন্ধে তিনি বাঙালী নাম রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধে সর্ব-সম্প্রদায়ের জাতীয় উৎসবের দিন হিসেবে জাতির সাধারণ পর্বদিন নির্দিষ্ট করার কথা বলেছেন, "এক জাতি হইতে গেলে জাতির সাধারণ পর্বদিন চাই। আমি মনে করি, ১লা বৈশাখকে আমরা জাতীয় নববর্ষ-দিন করিয়া লইতে পারি। তৎপরে কয়েকটি মহাপুরুষের দিন বাছিয়া লইয়া জাতীয় উৎসব দিন করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট ও হযরত মুহম্মদের জন্মদিনকে জাতীয় পর্বদিন করিতে বাধা কি?"

শহীদুল্লাহ্ বাল্যকাল থেকেই শরীয়তি বিধানসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। ইহলোক ও পরলোক দুই-ই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য তাঁর জীবনের সঙ্গে ধর্মীয় বিধান একাত্ম হয়ে গেছে। ধর্মের যেটা প্রগতিশীলতার দিক যেটি মোলবাদীদের হাতে পড়ে সংকীর্ণ আকার ধারণ করেছে শহীদুল্লাহ্ সাহেব সেখানেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচারকে যেমন প্রশ্রয় দেন নি তেমনি আধুনিকতা ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে যতটুকু খাপ খাওয়াতে পারে সেটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রধানত ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব আবুবকর সিদ্দিকীর নির্দেশে বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিছু অংশ 'মহাবাণী' নামে ১৯৪৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন কুরআন শরীফের সম্পূর্ণ অনুবাদ

১৯৪৯ সালে শেষ হয়। তার জীবনের দুটো খেদ ছিল। এক, কুরআন-এর হাফিয অর্থাৎ মুখস্ত করতে পারলেন না। দুই, নিজের জীবদ্দশায় কুরআন-এর অনুবাদ গ্রন্থাকারে বেরুল না। তাঁর কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁর ধারণা ছিল যে কুরআন শরীফের যথার্থ বাংলা অনুবাদ আজ পর্যন্ত হয়নি। গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫-১৯১০) অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল যে একজন অমুসলমান হিসেবে যতটা করা সম্ভব ততটা তিনি করেছেন কিন্তু একজন বিশ্বাসী মুসলমানের মনে যে অনুভূতি জাগে তার উত্তাপ অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) অনুবাদ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য ছিল যে তিনি অনুবাদে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতো অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য অনুবাদের ওপর জোর দিয়েছেন। কুরআন শরীফে অনেক আরবী শব্দ একাধিক অর্থ বহন করে। মুতাজিলা সম্প্রদায় যে অর্থটি যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই গ্রহণ করে থাকেন। সেজন্য ভক্তি ও বিশ্বাসের একটু অভাব দেখা যায়--বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। মাসিক মোহাম্মদী অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সংখ্যায় 'কুরআন অনুবাদ' প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় যে শহীদুল্লাহ্ সাহেব কুরআন অনুবাদ প্রসঙ্গে সনাতনপন্থী ছিলেন। এই নিয়ে আকরম খাঁর সঙ্গে তাঁর তর্ক বিতর্কও হয়েছিল। তার মানে এ নয় যে তিনি যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেছেন। ইসলামী একাডেমী পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় 'কুরআন অনুবাদের মূলনীতি' নামক প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কুরআন অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হলে কি কি বিষয়ে পারদর্শী হতে হয় যেমন আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে, কুরআনের ব্যাকরণ ভালভাবে জানতে হবে কারণ সাধারণ আরবী ব্যাকরণ থেকে কুরআনের ব্যাকরণ আলাদা। আরবী ভাষায় যে শব্দের সাধারণ অর্থ কুরআনে সেই শব্দের অন্য অর্থ এগুলি বুঝতে হবে। কুরআনের এক বাক্যের অর্থ অন্য বাক্য দ্বারা পরিস্ফুট হয়, কুরআনের একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুরআন শরীফে কতিপয় শব্দ অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেই ভাষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হয়। কুরআন অনুবাদকরা উপরোক্ত বিষয়ে সতর্ক না হয়েই অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হন ফলে স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটি দেখা যায়। অল্পবিদ্যা মহাভয়ংকরী হয়ে উঠে। যে অনুবাদগুলি বিশেষভাবে বহুপরিচিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব সেগুলির মধ্যে যেমন আকরম খাঁ, মুহম্মদ আলী, পামার, পিকথল এবং আরো অনেক অনুবাদকের দোষ-ত্রুটি দেখিয়েছেন। অনুবাদের মূলনীতিগুলির কথা তিনি যা বলেছেন সেগুলি অনুবাদকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। শুধু কুরআন শরীফ কেন যে কোন অনুবাদে মূলের প্রতি যেমন তাঁর বিশ্বস্ত ছিল তেমনি ছিল ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধা। তাঁর অনূদিত 'অমর কাব্য' (১৯৬৩) বইটির কথা বলা যেতে পারে। 'অমর কাব্য' দুটি আরবী কাব্যের গদ্যানুবাদ। 'কসীদাতুল্ বুর্দঃ' ও 'বানত সুআদ' যথাক্রমে শরফুদ্দীন বিন সঈদ বিন হসন বুসীরী ও কা'ব বিন যুহয়র রচয়িতা। দুটি কাব্যই হযরত মুহম্মদের মহিমাকীর্তন—স্বাভাবিকভাবেই শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রিয় ছিল। প্রসিদ্ধি আছে

যে বুসীরী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে রসূলুল্লাহর প্রশংসাসূচক এই কবিতা লিখে তিনি রোগমুক্ত হন। কা'ব ছিলেন আরবী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। হযরত মুহম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি 'বানত সু'আদ' রচনা করেন এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে শোনান। হযরত মুহম্মদ তাঁর কবিতা শুনে তাঁর চাদর তাঁকে দান করেন।

ইসলামী ঐতিহ্যের পরিচয় দানের জন্য তিনি শুধু অনুবাদ করেন নি, অন্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের যা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাও তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। এই অনুবাদ ভাবানুবাদ কিংবা সারানুবাদ নয় রীতিমত মূলরস যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় মূলভাষা থেকে সোজাসুজি অনুবাদ করেছেন। ইকবালের 'শিকওআহ্ ও জওআব-ই-শিকওআহ' (১৯৪২), 'দীওয়ান-ই-হাফিয' (১৯৩৮) 'রুবাইয়্যাত-ই-উমর খয়্যাম' (১৯৪২), 'বিদ্যাপতি শতক' (১৯৫৪) প্রভৃতি অনুবাদ-এর অন্যতর দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থগুলি অনুবাদ হিসেবে ততটা উল্লেখযোগ্য নয় কারণ পাণ্ডিত্যে তিনি যত দড় কাব্যশক্তিতে তত দড় নন। কবির জীবনী, আবির্ভাবকাল, ব্যাকরণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অনুবাদগুলি মূল্যবান। বিশেষ করে হাফিয ও উমর খয়্যাম সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি যে আলোচনা করেছেন অদ্যাবধি এক সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুল ইসলাম অনূদিত রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম এর ভূমিকা ছাড়া ঐরূপ জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা এ পর্যন্ত আর কেউ করেন নি।

মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার হয় নি, স্ত্রী শিক্ষা তো একেবারেই হয় নি। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তারের ভাবনা চিন্তা করেছেন। একাধিক শিক্ষা ও শিক্ষক সংক্রান্ত সম্মেলনে সভাপতিরূপে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কথা বলেছেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনায় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হয় যাতে এক শ্রেণী হীনমন্যতায় ভোগে—সুনীল গোপালের কথা থাকে কিন্তু রহিম আবদুলের কথা থাকে না। সেজন্যে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার প্রতিবিধান করতে চেয়েছেন।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব কিছু গল্প ও কবিতা লিখেছিলেন—এটি তাঁর সাধনার ক্ষেত্র নয় খেয়ালি মনের বিলাস মাত্র। পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনে কিছু গল্প ও কবিতা তাঁকে লিখতে হয়েছিল তারই প্রেরণায় বয়স্কদের জন্য কবিতা ও গল্প লিখেছিলেন। 'রকমারী' (১৯৩২) তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। তাঁর কবিতার পৃথক কোন গ্রন্থ নেই। তবে শহীদুল্লাহ্ সম্বর্ধনা গ্রন্থে (১৯৬৭) তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে।

বেদ উপনিষদ পুরাণ জাতক প্রভৃতি থেকে অনেক গল্পগাথা শিশুদের জন্য রচিত হয়েছে, হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শিশুদের উপযোগী করে করা হয়েছে কিন্তু কুরআন হাদীস প্রভৃতি থেকে তাদের উপযোগী গল্প, নবীকাহিনী, সাধকদের জীবনী,

ইসলাম ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি। শহীদুল্লাহ্ গবেষণা ও পড়াশুনার অবকাশে এই ফাঁক পূরণের জন্য কিছু কিছু গল্পগাথা জীবনী ইসলামি তত্ত্বকথা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন। 'ছোটদের রসূলুল্লাহ্' (দঃ) (১৯৬২), 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' (১৯৭১), 'ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা', 'চরিত্রকথা' (১৯৫২), ছোটদের নবীকথা (১৯৫৯), Tales from Quran (1970) প্রভৃতি এই জাতীয় গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে উপরোক্ত বইগুলি শিশুসাহিত্যের এক অমূল্য সংযোজন। শিশুসাহিত্য রচনায় শিশুর অন্তর নিয়ে শিশুমনে প্রবেশ করেছেন— পাণ্ডিত্য ও মনীষা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। কলকাতা থাকাকালে শিশুদের জন্য তিনি 'আঙ্গুর' নামে এক মাসিকপত্র বের করেছিলেন। পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র একবছর (১৩২৭ বৈশাখ—চৈত্র)। এ ছাড়া 'আল এসলাম' পত্রিকার সহসম্পাদক (১৩২২ বৈশাখ—১৩২৬ চৈত্র), 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র যুগ্ম সম্পাদক (১৩২৫ বৈশাখ ১৩২৭ চৈত্র) ছিলেন। কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা যাওয়ায় উপরোক্ত পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি কিন্তু নিজের প্রচেষ্টায় ঢাকাতেই কয়েকটি কাগজ বের করেছিলেন। ১৯২২ সালের আগস্টে 'The Peace' নামে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের এক মাসিকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন--১৯৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক মাসিক 'বঙ্গভূমি' ১৩৪৪ আষাঢ় মাসে বের করেন মাত্র দুটি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সর্বশেষ পাক্ষিক পত্রিকা 'তকবীর' বের করেন বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন -অনিয়মিতভাবে আঠারোটি সংখ্যা বেরুবার পর পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটে (১৩৫৪, ২৩ আশ্বিন—১৩৫৫, ৪ আশ্বিন)।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের লেখবার স্টাইলটি তাঁর নিজস্ব -সহজ সরল নিরাভরণ। কি ইংরেজি কি বাংলা সর্বত্র তাঁর ভাষা বক্তব্যের সহায় হয়েছে। শৃঙ্খলা আবেগবর্জিত পারিপাট্য, সংহতি, যথাযথতা, আভিধানিক স্পষ্টতা, অলঙ্কার বিরলতা, আতিশয্য-বর্জিত স্বচ্ছতা, বক্তব্যপ্রধান যে গদ্যরীতির চর্চা উনিশ শতকের ঐতিহ্য ছিল সেই সুমহান ধারার তিনি ছিলেন অন্যতম বাহক। তাঁর গদ্য যুক্তির গদ্য, চিন্তার গদ্য কারণ তিনি জ্ঞানচক্ষু দিয়ে ভুবন দেখেছিলেন। জ্ঞানই তাঁর কাছে প্রধান শক্তি ছিল। বিশ্বাসের এই দার্ঢ্য তাঁর গদ্যরীতিতে এনেছে ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। যুক্তিনির্ভর তথ্যাশ্রয়ী নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনায় নিরাভরণ বর্ণহীন অথচ প্রাঞ্জল ও সরস গদ্য রচনার উদাহরণ আমাদের সাহিত্যে ক্রমশ কমে আসছে। পাণ্ডিত্যের স্পর্ধা বা বিশেষজ্ঞের ভীতিপ্রদ তত্ত্বসমাবেশ তাঁর গদ্যে নেই। দরদী মন নিয়ে তিনি রসিকের মত রস গ্রহণ করেছেন। সাধু ও কথ্য ভাষার উভয় গদ্যরীতিতেই তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। স্টাইলের আলোচনা করতে গিয়ে মিডলটন মারে একবার বলেছিলেন গদ্যভাষা যত precise এবং simple হয় ততই ভাল। বাংলা গদ্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেব সেই রীতির অধিকারী—লেখার মধ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রেখেছেন।

সবশেষে বলা যেতে পারে অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে ম্যাগনাম ওপাস ধরনের কোনো গ্রন্থ না লিখেও মননের যে উৎকর্ষ তিনি রেখে গেলেন যার সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত বাঙালি জাতীয়তাবোধ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়ে বাঙালির নবজন্ম ঘটাল তার ভিত্তিভূমি একদা তিনিই রচনা করেছিলেন। এই কীর্তির মধ্যে তাঁর যেমন অমরত্বের আশ্বাস রয়েছে তেমনি সেটি তাঁর সারাজীবনের সাধনার প্রধান ফলশ্রুতিও ॥

৬

সৃজন স্বত্ত

ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচনাপঞ্জী

॥ প্রকাশিত গ্রন্থ ॥

১. Les Chants Mystiques de Kanha at de Saraha-প্রকাশক Adrien-Maisonneuve, Paris, 1928.

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Docteur de l' University dc Paris ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ।

২. Les Sons du Bengalic. Paris, 1928.

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Diplo-Phon. উপাধির জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা প্রবন্ধ। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা। অপ্রকাশিত।

৩. ভাষা ও সাহিত্য। ঢাকা ঃ প্রথম সংস্করণ, ঢাকা লাইব্রেরী ১৩৩৮ (১৯৩১), পৃ ১২৫। দ্বি-সং, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০।

৪. দীওয়ান-ই-হাফিয। ঢাকা ঃ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৩৮।

কবিজীবনী ও গযল পরিচিতিসহ মূল ছন্দে হাফিযের ৬০টি গযলের অনুবাদ।

৫. বাঙ্গালা ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ, ১৩৪২, ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৬১ ঃ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ঢাকা, পৃ ৪৪২।

৬. শিক্ওআহ্ ও জওয়াব-ই-শিকওআহ (নালিশ ও নালিশের জওয়াব) ঢাকা ঃ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী. (১৯৪২)। দ্বি- স ঢাকা ঃ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৫৪, পৃ ১৮। পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ (১৯৬৪) রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃ ১০২।

৭. রকমারী। প্রথম প্রকাশ ১৯৩২, দ্বিঃ সঃ ১৯৩৮, ৩য় সংস্করণ ১৯৫০, ঢাকা প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, পৃ ১০৭।

অনূদিত ও স্বলিখিত ১৩টি গল্পের সংকলন।

৮. অমিয়বাণীশতক। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮ (১৯৪১), পৃ ৩৬। ঢাকা ঃ পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৬২, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স।

মূলসহ মহানবীর ১০০টি বাণীর অনুবাদ।

৯. রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম। ঢাকা, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৪২। পৃ. ৯৮।
'উমর খয়্যামের খাঁটি কবিতা, উমর খয়্যামের জীবনী ও চরিত্র, উমর খয়্যামের মতবাদ শীর্ষক তিনটি নিবন্ধে কবিজীবনী ও কাব্য পরিচিতি; মূল ছন্দে ১৫১টি রুবাইয়ের অনুবাদ।

১০. ইকবাল। ঢাকা ১৯৪৫। প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫; পরিবর্তিত নতুন সংস্করণঃ ১৯৬৪, পৃ. ১৪৪।

১১. মহাবাণী। দ্বি. সং. বগুড়া ১৯৪৬, পৃ. ৪০।
সূরা ফতেহার অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্য এবং কুরআনের শেষ দশ অধ্যায়ের অনুবাদ ও ভাবার্থ।

১২. বাইঅতনামা। ঢাকাঃ রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৪৮।
কুরআন ও হদীসের উপদেশাবলীর অনুবাদ।

১৩. আমাদের সমস্যা। ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৪৯। পৃ. ৮৪।
ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষালিপি বিষয়ক ১০টি প্রবন্ধ সংকলন।

১৪. পদ্মাবতী। ১ম খণ্ড। ঢাকাঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৯৫০, পৃ. ৪০+২৮৬।
আলাওলের পদ্মাবতীর সংস্করণ, বিস্তারিত ভূমিকাসহ।

১৫. প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী। ঢাকা ১৯৫২, পৃ. ১৬।
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীর সংকলন এবং মন্তব্য। (ইহা ২২ নং পুস্তকে সংলগ্ন করা হইয়াছে)।

১৬. গল্প সঞ্চয়ন। ঢাকাঃ প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৫৩, পৃ. ২০৬।
সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে সম্পাদিত ১৬টি ছোট গল্পের সংকলন, ছোট গল্পের ধারা সম্বলিত ভূমিকাসহ।

১৭. বিদ্যাপতি-শতক। ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৪, পৃ. ২২+৬২+১০।
বিদ্যাপতির ১০০টি পদের পাঠনির্ণয় ও বাংলা পদ্যানুবাদ। কবিজীবনী ও মৈথিলী ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত ভূমিকাসহ। নূতন সংস্করণ ১৯৬৭।

১৮. বাংলা সাহিত্যের কথা। ১ম খণ্ড ঢাকাঃ রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৩, পৃ. ১৭৫। পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নতুন সংস্করণ ১৯৬৩। পৃ. ২০০।

১৯. বাংলা সাহিত্যের কথা। ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ) ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৫। পৃ. ৫৩৩।

২০. হজ্জের ও রওযা পাকের দো'আ দরূদ। ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৫৭। পৃ. ৬৪।

২১. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। ঢাকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯। বাংলা ভাষার বিস্তৃত ইতিহাস। দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২০৮।

২২. শেষ নবীর সন্ধানে। ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৬১।
হযরত মুহম্মদ (দঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ।

২৩. মহর্রম শরীফ। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৩।

২৪. রোযাহ্ 'ঈদ ও ফিতরাঃ'। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৩ সন।

২৫. অমর কাব্য। প্রথম সংস্করণ ১৩৭০, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, পৃ [illegible]।
শায়খ ইমাম আবু আবদিল্লাহ্ মুহম্মদ শরফুদ্দীন বিন্ হসন বুখারীর 'কসীদতুল বুর্দ' এবং কা'ব বিন্ যুহয়র রচিত 'বানত-সুআদ' আরবী কাব্যদ্বয়ের মূল হইতে গদ্যানুবাদ।

২৬. ইসলাম প্রসঙ্গ। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩ ; রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, পৃ ১৪[illegible]।
২০ প্রবন্ধ ও হযরত বড় পীর সাহেবের রচিত কসীদায় গওসিয়ায় কাব্যানুবাদ সহ।

২৭. ছোটদের রসূলুল্লাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮৬।

২৮. বাংলা আদব কী-তারীখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৬[illegible]
প্রথম খণ্ড পৃ ১—১৭৯, প্রাচীন ও মধ্যযুগ। (অপরাধ আধুনিক যুগ সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত।) উর্দুভাষীদের জন্য বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

২৯. Essays on Islam Bogra 1945, pp. 118.
ইসলাম সম্পর্কে লেখা সাতটি প্রবন্ধ সংগ্রহ।

৩০. Hundred Sayings of the Holy Prophet. First published, 1945 translations with Arabic text of 100 sayings of the Prophet from Mashariqul Anwar.

৩১. Traditional Culture in East Pakistan. First published : 1963. Department of Bengali, University of Dacca, pp. 191.
A survey under the auspices of UNESCO with Co-author Prof. M. A. Hai.

৩২. Buddhist Mystic Songs. First Published 1960, New Ed. 1966 Bengali Academy, Dacca pp. 182.
47 oldest Bengali and other Eastern Vernacular Songs by 22 poets translated with annotations.

৩৩. ছোটদের নবীকথা—চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ ৯০।

৩৪. কথামঞ্জরী—[illegible] সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা পৃ ৮৫।

৩৫. নীতিকথা—[illegible] সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা পৃ ৬৪।

৩৬. জ্ঞানের কথা -২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা পৃ. ১০৩।
৩৭. চরিতকথা ১ম ভাগ। ২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা পৃ. ৮৭।
৩৮. চরিতকথা, ২য় ভাগ। ২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা পৃ. ৯৯।
এতাদ্দরিক্ত অনেক স্কুলপাঠ্য রচয়িতা।
৩৯. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (বর্তমান নাম বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান) খন্ড ১-৩ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বর্তমানে দু'খণ্ডে সমাপ্ত।
৪০. কুরআন প্রসঙ্গ। ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পৃ. ৮+১৪৩, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।
৪১. Pearls from the Holy Prophet. pp. 120. ঐ
৪২. Tales from Quran. May 1970, pp. 31. ঐ
৪৩. নবীকরিম হযরত মুহম্মদ (দঃ), মার্চ ১৯৭৫। ঐ
৪৪. Islam and Humanism 2nd ed. September 1979, pp 4+22. Dacca, Islamic Foundation.

খ. ড. শহীদুল্লাহকে লিখিত চিঠি

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

১

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন –

"বিশ্বভারতী"কে সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ প্রায় সমাধা হইয়াছে। Constitution পত্র রেজেস্ট্রি হইবার সময় আসিয়াছে। আপনাকে ইহার সংসদের (Managing Committee) সদস্যরূপে বরণ করা হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সম্মতি জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তির কোন কারণ হইতে পারে না। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
ওঁ

শান্তিনিকেতন
বীরভূম

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবাক হইয়াছি, আপনি আমার "জীবনস্মৃতি" ও "ছিন্নপত্র" পুস্তক হইতে কয়েক অংশ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছেন, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানিবেন ইতি ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।[১]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
ওঁ

Visva-Bharati Santiniketan Bengal

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আপনার ভাষা ও সাহিত্য[২] বইখানি পড়ে খুসি হয়েছি। এতে ভাববার ও শেখবার কথা বিস্তর আছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের আহ্বান করে আপনি যে প্রবন্ধ কয়টি লিখেছেন, তা হিন্দুদেরও বিচার্য। বাংলা ভাষাতত্ত্ববিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার প্রশংসা অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আপনি আমাকে যে সাধুবাদ দিয়েছেন তাতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি[৩]। যে সময়ে আমি এই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম তখন এ পথে আমি ছিলাম একা। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমি সম্পূর্ণ আনাড়ি। অন্ধকারে আমার হাতে প্রদীপ ছিল না, হাৎড়িয়ে বেড়িয়েছি। যখন থেকে আপনাদের হাতে আলো জ্বলল,তখন থেকেই এ অধ্যবসায় ত্যাগ করেছি।

বাংলা ভাষায় আরবী ও পারসী সাহিত্যের অনুবাদ অবশ্য কর্তব্য তাতে আমার সন্দেহ নেই। যদি বিশ্বভারতীর অর্থ দৈন্য কখনো দূর হয়ে তবে একাজে নিশ্চয় প্রবৃত্ত হব।

বিদেশী ভাষার উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা বর্জনীয় বলে আমি মনে করি। কবিতার একদিকে ভাবার্থ, আর একদিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কোনমতেই চালান করা যায় না। চেষ্টা করতে গেলে ভাবার্থের প্রতিও জুলুম করতে হয়। এই কারণেই পদ্যে আপনার হাফেজ অনুবাদ চেষ্টার আমি অনুমোদন করতে পারলাম না। ইতি ২৯ জুলাই ১৯৩২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan Santiniketan Bengal
2.9.36

সাদর নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনার বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি পড়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। ব্যাকরণখানি সকল দিকেই সম্পূর্ণ হয়েছে -এতে ছাত্রদের উপকার হবে। বইখানি আমার এখানকার বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের হাতে দেব—তাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক ব্যবহার করবেন।

ইতি ১৩৪৩[১]
ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

১

SUNITI KUMAR CHATTERJI
M. A. (Cal.) D. Litt. (London) F.R.A.S.B.
Khaira Prof. of Indian Linguistics and
Phonetics and Head of the Department
of Comparative Philology.
Residence : 'Sudharma', 16, Hindusthan Park
P.O. : Rasbihari Avenue, Calcutta

Asutosh Building
The University
CALCUTTA
Date 22 October 1942

প্রিয়বরেষু,

নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছি বলিয়া দাওয়াৎ-এ শরীক হইতে পারিলাম না, বাড়ীতে অসুখ বিসুখ চলিতেছে, স্বয়ং গিয়া দেখা করিতে পারিলাম না।[২] তজ্জন্য ক্ষমা

করিবেন। এই আনন্দোৎসবে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী পাঠাইতেছি---অন্তর হইতে বরকন্যার মঙ্গল কামনা করিতেছি। মিষ্টান্ন-গ্রহণ আপাততঃ মুলতুবী রহিল। আশা করি সমস্ত কুশল। ইতি ৪ঠা কার্তিক ১৩৪৯

ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মৌলবী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব সমীপে

SUNITI KUMAR CHATTERJI
M.A. (Cal.) D. Litt. (London) F.R.A.S.B.
Khaira Prof. of Indian Linguistics and
Phonetics and Head of the Department
of Comparative Philology.
Residence : 'Sudharma', 16, Hindusthan Park
P.O. • Rasbihari Avenue. Calcutta.

Asutosh Building
The University
CALCUTTA
Date 22.10.1942

॥৭॥ প্রিয় মিত্রবর অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম কল্যাণীয় আয়ুষ্মান্ ও শ্রীমান্ মৌলবী আবুল ফযল্ মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ ও পরম কল্যাণীয়া আয়ুষ্মতী শ্রীমতী জাহান-আরার শুভবিবাহে আমার আন্তরিক শুভকামনা এবং আশীর্বাদ জানাইতেছি।

প্রাচীন ভারতের মনীষীরা মানুষের জীবনের লক্ষ্য "চতুর্বর্গ" অর্থাৎ চারিটী "পুরুষার্থ" বা প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —এই চারিটি লইয়া চতুর্বর্গ। দক্ষিণ ভারতের স্ত্রীকবি ঔবৈয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন তামিল ভাষায় রচিত একটি পদে চতুর্বর্গের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন---

"দান অর্থাৎ ত্যাগ-ই ধর্ম ;
পাপ ব্যতীত আর সব কিছুর উপার্জন-ই অর্থ ;
স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মনে মনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি রাখিয়া
জীবনে যে অবলম্বন পায় তাহাই কাম।
পরাৎপরকে চিন্তা করিয়া, ধর্ম অর্থ কামের উর্দ্ধে অবস্থান
পূর্বক যে শ্রেষ্ঠতর আনন্দধাম লাভ করা যায়,
তাহাই মোক্ষ।"

এই বিবাহ বর ও কন্যা উভয়ের জীবনে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের সুখময় পথ হউক। ইহা বর ও বধূর জীবনকে অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত করুক। এবং এই

বিবাহ নিজ পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়, ও ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র জাতির পক্ষে মঙ্গলবহ হউক। গৃহস্থাশ্রম বর-বধূকে দেশের ও দশের সেবায় উদ্বুদ্ধ করুক।

বহুদর্শী প্রাজ্ঞ পারসীক কবি শেখ সাদীর সূক্তি,

"জনে-খূব্, ফর্‌মান-বর্, পার্‌সা।
কুনদ্ মর্‌দে-দরবেশ-রা বাদ্‌শাহ্॥"

(গুণবতী, অনুগতা সাধ্বী স্ত্রী দরিদ্র পুরুষকেও রাজা করিয়া দেয়।)

-এই সূক্তিকে সার্থক করিয়া নববধূর গুণে ও সৌভাগ্যে আজিকার "নওশাহ্" জীবনে সত্যকার "বাদ্‌শাহ্" হউন —রাজপদের সঙ্গে তুলনীয় সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হউন।

"অল্-লধ্বীন্ য়ু'ব্‌মিনূন্ বি-ল্ খয়্‌বি, ব্ য়ুক্বীমূনা-স্ব-স্বলাথ্।"

"যাহারা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করে, ও প্রার্থনা বজায় রাখে;" আমরা অদৃশ্য শক্তি বা সত্তা —যে সত্তা নিজ স্বরূপে এক এবং অদ্বিতীয়, এবং বিশ্বমধ্যে ও মানুষের অন্তরে নিজ বহুবিধ প্রকাশে অনন্ত —সেই সত্তায় বিশ্বাস করি এবং সেই সত্তার নিকট আত্মনিবেদন করি ও প্রার্থনা করি। আরবী ভাষায় গ্রথিত সেই শাশ্বত সত্তার -অর্থাৎ পরমেশ্বরের নবোত্তর-নবতি শুভ নামাবলীতে, তাঁহাকে "রশীদ" অর্থাৎ পরিচালক "হাদী" অর্থাৎ পথপ্রদর্শক এবং "হফ্বীয়ব্" বা 'হফীজ' অর্থাৎ রক্ষাকর্তা বলিয়া আবাহন করা হইয়াছে। এই শুভ অবসরে আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিকভাবে ইহাই প্রার্থনা করি, তিনি নব বরবধূকে জীবনে 'এর্শাদ' অর্থাৎ পরিচালনা করুন, 'হেদায়ৎ' অর্থাৎ সত্যপথের নির্দেশ দিন এবং 'হেফাজৎ' অর্থাৎ সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ইতি বৃহস্পতিবার ৫ই কার্তিক শারদীয়া শুক্লা ত্রয়োদশী সন ১৩৪৯ সাল, ইংরেজী ২২শে অক্টোবর ১৯৪২॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২

SUNITI KUMAR CHATTERJI
M. A. (Cal.), D. Litt. (London) F.R.A.S.B.
Khaira Prof. of Indian Linguistics and
Phonetics and Head of the Department
of Comparative Philology.
Residence ; 'Sudharma', 16, Hindusthan Park
P. O. : Rasbihari Avenue, Calcutta.

Asutosh Building
The University
Calcutta
Date 6 Dec. 1942

Dear Dr. Shahidullah,

I have dipped into your Omar Khayyam* occassionally, and I find the translation extremely well-done. Where could we find your

equal for work of this type, familiar as you are with Persian poetry and its fragnant atmosphere and knowing as you do your mother tongue and its powers of expression inside out ?

Trusting this will meet you in the best of your health and spirit, I remain,

Yours sincerely
Suniti Kumar Chatterji

গ. ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চিঠি

১

Dr. Muhammad Shahidullah
M.A. B.L. (Cal), Dipl. Phon (Paris)
Docteur De L' Universite De Paris

Office of the Principal
A. H. College, Bogra
The 18th June 1945

To

The Asst. Secretary to the Govt. of India,
Department of Education, Health and Lands,
Simla (the Punjab).
Through the President of the Governing Body
The Azizul Haq College, Bogra (Bengal).
Re: Professors—Kabul University

Sir,

I have the honour to offer myself a candidate for the post of the Professor of Veda and Avesta in the Kabul University.

As regards my qualifications I beg to state that I passed the B. A. Examination with Honours in Sanskrit of the Calcutta University with the Veda as one of the subjects in 1910 and the M. A. Examination in Comparative Philology in 1912 being the first student to pass in that subject from the Calcutta University. For my M. A. Degree I had to make a comparative study of the Vedic and Avesta languages. I obtained the Doctorate of the University of Paris with the mention 'Tres Honourable' in 1928 and Diploma of the same University in Experimental Phonetics in the same year. I studied the Veda with Professor Jules Bloch of the University of Paris and Professor E.

Leumann of the University of Frieburg in Germany, Comparative Philology with Professor A. Meillet of the University of Paris and also Avestan with him and old Persian with Professor Beuveniste of the same University.

I was granted the State Scholarship for Scientific study of Sanskrit in Europe in 1913 by the Government of India. But for medical reason I could not avail of it. I, however, went abroad in 1926 and studied in the Universities of Paris and Frieurg (Germany) from 1926 to 1928.

I served the Calcutta University from 1919 to 1921 as Research Assistant and the Dacca University from 1921 to 1944, sometimes as Head of the Department of Sanskrit and Bengali and lastly as the Head of the Dept. of Bengali. I also served as the Provost of three Muslim Halls of the University of Dacca. At present I am serving the Azizul Hauque College (First Grade) Bogra, Bengal as its Principal.

I have been in Educational service since 1919 and have been a successful professor and disciplinarian. I have 23 years of intimate acquaintance with the corporate life and activities of the first residential Univeasity of India.

I have acquaintance with a number of languages, ancient and modern including Vedic, Avestan, Sanskrit, Old Persian, Tibetan, Arabic, Modern Persian, Hebrew, Urdu, Hindi, English, French and German. I have also an elementary knowledge of Pashto.

I have published my thesis for the Doctorate of the University of Paris tn French entitled 'Les Chants Mystiques' on Indology which has been favourably reviewed by eminent scholars of Europe. I translated and published in Bengali from Original Persian the Divan-i-Hafiz' and Rubayyat of Omar Khayyam with valuable introductions. I have also translated and published Iqbal's Shikwah O Jawab-i-Shikwah into Bengali Verse. I have published articles on Linguistic in learned journals and I have read learned papers of research in different sessions of the All-India Oriental Conference and other distinguished gatherings. Beside these, I am the author of a

number of books. I edited and published a monthly English journal named 'Peace' devoted to Islamic Culture about four years.

I have presided over a number of Conferences among which I should like to mention the PhilologySection of the All India Oriental Conferences, Hyderabad (Deccan) Session in 1941. I am member of the Standing Council of the All India Muslim Educational Conference Aligarh. and of the Nadwatul Ulama, Lucknow and of the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta. I am one of the foundation members of the Visva-Bharati of Rabindranath Tagore.

My age according to the Matriculation Certificate of the Calcutta University is 58 years. I expect a minimum salary of Rs. 700/- besides the house allowance.

I possess testimonials as regards my qualifications and character from eminent scholars and educationists like Mahamahopadhaya Hara Prasad Sastri, Professor Sylvan Levi, Sir P. J Hartog, Sir P. C. Roy and others. I shall send the copies of my testimonials later on as they are not with me at present. A list of my important articles and works will also be sent later on if required.

I hope that this application will receive your best consideration.[৭]

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Md. Shahidullah

২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখিত

3rd April 1949

Dear Sir,

I being to state that I joined the Dacca University as a Supernumerary teacher for six months from November 1948 to April 1949 after obtaining six months' leave without pay from the Azizul Huq College, Bogra. But unfortunately the Secretary of the College has asked me to tender resignation with effect from the 1st May 1949.

Under the circumstances I am willing to serve this University as whole time teacher or a Supernumerary teacher for the whole Session If you will kindly agree I shall be glad to accept the new appointment on Rs. 800/- P. M. from the 1st May 1949 to 30th June 1951 in modification of the previous decision of the Executive Committee.

Thanking you,
Yours faithfully,
Md. Shahidullah

৩

এ. এ. আহমদ আলী জামীকে লিখিত। ৩-৫ ৩

ফোন ঃ ৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগম বাজার রোড,
ঢাকা
২৬. ৪. ৬৪ ইং

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ. বি-এল (ক্যাল) ডিপ্লো-ফোন,
ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

রমযান শরীফের রোযা, ইতিকাফ এবং অন্যান্য কারণে যথাসময়ে তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য দুঃখিত। গতকল্য আমার "অমর কাব্য"[৮] রেজিস্টারি বুক পোস্টে পাঠাইয়াছি। কুরআন শরীফ মায় উর্দু তর্জমা ওখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; তাহার হাদিয়া কত জানাইবে। আমার সাহিত্য প্রকাশ (কোন্ ভাগ ?) এবং সরল বাংলা ব্যাকরণ এখনও পাঠ্য আছে, জানিয়া সুখী হইয়াছি। উহার প্রকাশকের নাম লিখিবে অবশ্য অবশ্য। কারণ কিছুই লভ্যাংশ পাইতেছি না। এবার ইসালে সওয়াবে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্ চাহিলে আগামীবারে দেখা যাইবে। একরকম আছি। তোমার মঙ্গল কামনা করি। চিঠিপত্র সংক্ষেপে লিখিবে। তোমার পরীক্ষার সফলতার জন্য বিশেষ দু'আ করি। ইতি –

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৪

ফোন ঃ ৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগম বাজার রোড
ঢাকা ১
২২. ৯. ৬৪

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ. বি-এল (ক্যাল) ডিপ্লো-ফোন,
ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

দো'আ ও সালাম মসনুন অন্তে। তোমার পত্র পাইতেছি ; কিন্তু আমার সময়াভাবে সত্বর উত্তর দিতে অপারগ। অফিসের কাজ[৯] সকাল ৯॥ হইতে বৈকাল ৪॥ পর্যন্ত।

তাহার পরে বই-কিতাব লেখা। আমার কুরআন শরীফের অনুবাদ যাহা হুযুর কিবলাঃ মরহুম মগফুরের[১০] আদেশে ১০ বৎসর পূর্বে শেষ করিয়াছি, এখন তাহা নযরসানী করিয়া ছাপাইবার জন্য আয়োজন করিতেছি। তর্জমা এবং হাশিয়া থাকিবে। হুযুর সজ্জাদানসীন সাহেবের অনুমতিক্রমে আরবী মতন থাকিবে না। কিন্তু অয়াতের সংখ্যা থাকায় মূলের সঙ্গে মিলাইয়া পড়া যাইবে। কুরআন পাক সকল মানুষের জন্য। কিন্তু আরবী থাকিলে সকলের স্পর্শ নিষিদ্ধ। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার জাগরণ[১১] পত্রিকায় ইহার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। 'অমর কাব্যে'র মূল্য মাত্র ১ টাকা। উহার চাহিদা আছে। তোমার মাদ্রাসায় থাকিলে বিক্রয়ের জন্য কয়েক কপি পাঠাইতে পারি। ভাল চাই। ইতি -

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৫

৩০. ৪. ১৯৬৬ ইং

পরম স্নেহভাজন,

দু'আ ও সালাম মসনুন অন্তে সম্প্রতি তোমার দুইখানি পত্র ও সীরাতুন্নবী পাইয়া খুশী হইয়াছি। তুমি আমার ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (দঃ)[১২] বইখানি দেখিয়াছ কি? পীর সাহেব হুযুরকে কিছুদিন পূর্বে পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার জবাব পাই নাই। তাঁহাকে আমার সালাম পেঁছাইয়া দিবে। আমার নানা কাজ। সেজন্য সত্বর উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশের একজন জামালুদ্দিন নামে এখানে বহু বৎসর আগে ছিল। তাহার বাড়ী তোমাদের ঐ দিকে। যদি সংবাদ জান, আমাকে জানাইবে। তোমার পরীক্ষায় কামিয়াবীর জন্য দু'আ করিতেছি। ভাল আছি। ইতি—

দু'য়া গো
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মুহম্মদ নূরুল্লাহকে লিখিত ৬-১১,৬

৬

Nazimabad, Karachi
16. 7. '59

দো'আবরেষু,

তোমার ৭ই তারিখের পত্র যথাসময় পাইয়াছি। সাজির মার উত্তরধারের জমি দেওয়া ঠিক। ঐ জমি কে করিতেছে? সে ঐ জমি ছাড়িবে তো? তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র যাহা যাহা যাহাকে যাহাকে লিখিতে হইবে, তাহার মুসাবিদা ঢাকার ঠিকানায়

A. J. M. Taquiyyullah (বেলাতের) নামে পাঠাইয়া দিবে। আমি আল্লাহ্ চাহেন তো সেখানে ২৩শে হইতে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত থাকিব।

জমিলার সম্বন্ধে আমিও অস্বস্তি বোধ করিতেছি। চিঠিপত্র দ্বারা কিছু হইবে না। তুমি ও নসীরুল্লাহ একবার জমিলাকে সেখানে লইয়া যাও। অবশ্য যাইবার পূর্বে জামাইকে পত্র দিবে। যদি জমিলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে জামাই নিষেধ করে তবে তোমরা গিয়া তালাকনামা লইয়া আসিবে।

জমি জমা ওয়াকফের জন্য সম্ভবতঃ আগামী ডিসেম্বরে আমি ছুটি লইয়া পেয়ারা আসিতে পারি। আমার ইচ্ছা ওয়াকফ হইতে মসজিদ এবং একটি মকতবের খরচপত্র নির্বাহ হয়। একই ব্যক্তি মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং মকতবের শিক্ষক হইবেন। তাঁহার বেতন কমপক্ষে কত হওয়া দরকার জানাইবে। নসীরুল্লাহ মিঞা এই কাজের ভার লইলে আমি সুখী হই। মুনশী বাড়ীর কাহারও এই কাজে আসা দরকার. বংশের সুনামের জন্য। এক্ষণে জ্ঞাতব্য আমার ওয়াকফ হইতে বার্ষিক আনুমানিক কত আয় হইতে পারে। অবশ্য একজন মোতায়াল্লী এবং একজন নায়েব মোতায়াল্লী থাকিবে। মসজিদ ও মকতবের খরচ বাদে মোতায়াল্লীকে জমি দেখাশোনা বাবদ সমস্ত আয় দিতে হইবে। কাহাকে মোতায়াল্লী নিয়োগ করা যায়, ঠিক করিবে। তোমার নামে আমার আম মোক্তারনামা দেওয়া আছে সুতরাং তোমাকেই মোতায়াল্লী এবং এনায়তুল্লাহকে নায়েব মোতায়াল্লী করা আমার একান্ত ইচ্ছা।

মেহেরুল্লাহর ও নেয়ামতুল্লাহের পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে? তাহারা যেন বাপ-দাদার নাম না ডোবায়। আমি মেহেরুল্লাহকে আবুসালেহ মিঞা মারফতে ৬০ টাকা দিয়াছি।

এখানকার সংবাদ ভাল। বকুল আজ রাত্রে ঢাকায় রওয়ানা হইবে। সে সেখানে কিছুদিন থাকিবে। প্যারিস ওয়াসিংটনে ভাল আছে। তাহার ঠিকানা

Dr. A. B. M. Naquiyullah
709 East Capital St., S. E.
Washington D. C.
U. S. A.

বাড়ীর ও দেশের সকলকে দো'আ ও সালাম। ভাবীকে বিশেষ করিয়া সালাম জানাইবে। তিনি কেমন আছেন, ঢাকায় যাইবেন কিনা জানাইবে। পত্রের উত্তর ঢাকায় লিখিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৭

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ. বি-এল (ক্যাল), ডিপ্লো-ফোন,
ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

ফোন : ৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯ বেগম বাজার রোড
ঢাকা ১

২৪. ১. ১৯৬৫

পরম স্নেহভাজন,

দুআ ও সালাম মসনুন অন্তে। তোমার ২রা তারিখের পত্র ১১ই তারিখে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। অফিসের কার্যের[১৩] অতিরিক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা, পুস্তক রচনা ও প্রকাশ প্রভৃতি কার্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে পত্রোত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য কিছু মনে করিবে না। আমার বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ)[১৪] প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার বই শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। আমার তর্জমা কুর্‌আন শরীফ প্রকাশের চেষ্টায় আছি।[১৫] তোমার বা তোমাদের স্কুলে আমার কি কি বই আছে, জানাইলে কিছু বই স্কুলের জন্য পাঠাইয়া দিব। সফী[১৬] কয়েকমাস হইল চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে। সেজন্য অস্থির আছে। আমরা আল্লাহের মরজীতে সকলে সহী সলামতিতে আছি। তোমাদের খবর ও দেশের খবর জানাইবে। বিশেষতঃ আবদুল জলীল ভাইয়ের[১৭] অবস্থা জানাইবে গ্রামের মধ্যে বোধ হয়, উনিই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন। কলিকাতায় আবু সালেহকে[১৮] ১০০ টাকা তোমার নামে পাঠাইতে লিখিতেছি। ঐ টাকা হইতে আবদুল জলীল ভাই এবং অন্যান্য যাহারা বিশেষ অভাবগ্রস্ত তাহাদিগকে আমার তরফ হইতে যাকাত স্বরূপে দিবে। হাড়োয়া স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত, তন্মধ্যে মুসলমান কত? মুসলমান ছাত্রেরা second language কি পড়ে? মেহেরুল্লাহ্[১৯] দেশে গিয়াছে। কিন্তু চিঠিপত্র লেখে নাই। তোমরা বাড়ীর সকলে আমাদের ঈদ মুবারক জানিবে এবং গ্রামস্থ সকলকে সাধ্যমত জানাইবে। ইতি—

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৮

৭৯, বেগম বাজার রোড
ঢাকা
১৭. ৪. ১৯৬৫

পরম স্নেহভাজন,

দুআ ও সালাম মসনুন অন্তে। ঈদ মুবারক জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। পূর্বের পত্রে ১০০ টাকা কিরূপে খরচ করিলে জানিতে চাহিয়াছিলাম, কারণ উহা যাকাত ফণ্ডের টাকা। সম্প্রতি কাজী মুহম্মদ মুস্তাফার[২০] একটি পত্র পাইয়াছি।

উনি হাড়োয়া স্কুলের শিক্ষক। পিতার নাম কি এবং কোথায় বাড়ী জানিলাম না। উনি শেষ নবীর সন্ধানে[২১] এবং ইসলাম প্রসঙ্গ[২২] পুস্তক দুইখানি চাহিয়াছেন। ঐ পুস্তক দুটি কি হাড়োয়া স্কুলে আমি পূর্বে দিই নাই? আমার অন্য পুস্তকগুলি যদি স্কুলে না থাকে পাঠাইয়া দিব—১. শিক্‌ওয়াহ (অনুবাদ)[২৩] ২. ইকবাল[২৪] ৩. বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড) ৪. ছোটদের রসূলুল্লাহ্। আমরা ভাল আছি। তোমাদের কুশল কামনা করি। ইতি –

শুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৯

দর্শনা
১২. ৭. ১৯৬৫

দু'আবরেষু,

তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি যে B. A. পাশ করিয়াছ, তাহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং ইহপরলোকে মঙ্গল দান করুন- এই দু'আ করি। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে এনায়তুল্লাহের মুখে কিনা শুনিয়া এক তরফা কিছু করা যায় না। তবে তুমি খোঁজ-খবর লইয়া কোন্ জমি বিক্রয় করিয়াছে, কোন্ জমি প্রজাবিলি করিয়াছে তাহা আমাকে জানাইলে আমি তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে পারি।

তুমি যে পুকুর কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতে জমির কোনও ক্ষতি না হইলে, আপত্তি হইতে পারে না।

তোমাকে যে ১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যাকাতের জন্য। এই জন্য তুমি কাহাকে কত দিলে জানা প্রয়োজন।

তুমি উচ্চতর শিক্ষার জন্য যে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে মোবারকবাদ দিতেছি। এই দু'আ করি যেন আল্লাহ্ তোমার ইচ্ছা পূরণ করেন।

আমি এখানে গতকল্য মীলাদ মিটিং উপলক্ষে আসিয়াছি। আগামীকাল ভার্সালিয়ার আকরু ভাইয়ের পুত্র গোরা মিঞার অনুরোধে চুয়াডাঙ্গায় মীলাদ মহফিল উপলক্ষে যাইব। সেখান হইতে ইন্‌শাআল্লাহ বুধবার যশোহরে গিয়া প্লেনযোগে ঢাকায় রওয়ানা হইব। ঢাকায় সকলকে ভাল দেখিয়া আসিয়াছি। আমি ভাল আছি। তোমার ছেলেমেয়ের বিষয়ে আমাকে জানাইবে। তোমাদের সকলের জন্য এবং বাড়ী ও গ্রামের জন্য সকলকে দু'আ করি। ইতি

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুনশ্চ: তোমার স্কুলের শিক্ষক মুস্তাফা সাহেবের পত্র পাইয়াছি। অবসরক্রমে তাহার উত্তর দিব।
মু. শ.

১০

ফোন-৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগম বাজার রোড,
ঢাকা-১
১. ৮ ১৯৬৬

কল্যাণবরেষু,

দু'আ ও সালাম মসনূন অন্তে। তোমার পত্রগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু অফিসের অতিরিক্ত অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। জমি-জমার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার তোমার উপর দিয়াছি। তুমি যাহা উপযুক্ত মনে কর করিবে। আল্লাহরাখার সম্বন্ধে আমি এখান হইতে কি করিতে পারি? টিনের ঘরটি মেরামত করিবে। কোঠার মেরামত পরে হইবে কিন্তু হইবে কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। মসজিদের আবশ্যকীয় মেরামত অবশ্য করিবে। সেখানে কল বসাইবার খরচ কে দিবে। তুমি জান এখান হইতে কিছু পাঠানো অসম্ভব। আবদুল জলিল ভাইয়ের জন্য দুঃখ হয়। তিনি গ্রামের মুরুব্বি। যদি পার আমার টাকা হইতে তাঁহাকে যাকাতস্বরূপে কিছু দিবে। তোমার ছেলেমেয়েদের নাম বয়স এবং তাহারা কি পড়াশোনা করিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। সাতক্ষীরার আবদুর রউফের ছেলেমেয়েদিগকে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য করিতেছি। মেহেরুল্লাহের কাপড়চোপড় এবং লেখাপড়ার খরচ দিতেছি। সে হামিদুল্লাহের বাড়ীতে খায়, শোয়। দেশের বাড়ীতে যাইবার আমার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু এখন নিরুপায়। তোমাদের স্কুলে আমার রচিত কিছু বই দিতে চাই। আমার বই ওখানে কি আছে, জানাইবে। এখানকার খবর ভাল। বাড়ীর ও গ্রামের খবর জানাইবে। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্তের আযান এবং জুমার নমাযের কি উপায় করা যায়, লিখিবে। জানিও মসজিদ বিরান হইলে, গ্রামও বিরান হইয়া যাইবে। সকলকে সাবধান করিবে। ইতি

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১১

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ., বি-এল, (ক্যাল),
ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি।

ফোন ঃ ৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগমবাজার রোড
ঢাকা-১
২৬. ৩. ১৯৬৬

আমি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এতদ্বারা আমার পেয়ারা গ্রামস্থিত সমস্ত প্রজাকে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ এনায়তুল্লাহের অবর্তমানে আমার অন্য

ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ নুরুল্লাহকে আমার প্রাপ্য খাজনা ধান ইত্যাদি আদায় দিয়া রশীদ-পত্র লইবে এবং তাহার আদেশ অনুযায়ী কার্য করিবে। ইতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১২

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে লিখিত। ১২-১৫/৪

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ বি. এল (ক্যাল) ডিপ্লো-ফোন
ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

ফোন-৪৫৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯. বেগমবাজার রোড,
ঢাকা ১

সম্পাদক মহাশয়, এই পত্রখানি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন। বিশেষ বাধিত হইব। ১৭. ৪. ১৯৬৫। মু. শহীদুল্লাহ্

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সমীপে। (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা।

যথাবিহিত অভিবাদন অন্তে। আপনার লিখিত "পীর গোরাচাঁদ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া সুখী হইলাম। আমি এই পীর সাহেব সম্বন্ধে আমার অচির প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের কথা" (২য় খণ্ড মধ্যযুগ) পুস্তকে লিখিয়াছি।[২৫] আমার অবলম্বন আমার পরলোকগত ভ্রাতা মুন্সী মুহম্মদ এবাদুল্লাহ্ প্রণীত পুস্তক "পীর গোরাচাঁদ" (১৩১৭ সালে প্রকাশিত) এবং Mr. O'Malley I. C. S. রচিত Bengal District Gazetteer এর 24 Parganas (১৯১৪ ইং সনে প্রকাশিত)। আপনার অবলম্বিত গায়নের গানের বিবরণের সহিত আমার লিখিত পীর গোরাচাঁদের বৃত্তান্তের অনেক মিল আছে। আপনার উদ্ধৃত অংশে কয়েকটি সংশোধন আবশ্যক। আলমপুর -আনরপুর হইবে। আনোয়ারপুর বারাসতের নিকটবর্তী। সেখানে একদিল পীরের আস্তানা আছে। হেতেঘরে—হেতেগড়ে হইবে। পরলোকগত আবদুল গফুর সিদ্দিকী[২৬] আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস বসিরহাট মহকুমার খাসপুর গ্রাম ছিল। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার পঠিত প্রবন্ধটি কোথায় প্রকাশিত হয়, জানাইলে বাধিত হইব।

আমার নিজ পরিচয় দিতেছি। আমি পীর গোরাচাঁদের সেবায়েত (খাদিম) বংশীয়। আমি ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই হাড়োয়ার নিকটবর্তী পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। দুই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরলোকগত ড. দীনেশচন্দ্র সেনের[২৭] সহকারীরূপে কাজ করিয়াছিলাম। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[২৮] সহকারীরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। বর্তমানে ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে ইসলামী বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করিতেছি। এক্ষণে নিবেদন এই যে আপনার একটু পরিচয় দিয়া বাধিত করিবেন। আপনাকে বসিরহাট নিকটবর্তী স্থানের

অধিবাসী বলিয়া মনে করিতেছি। আপনার অবলম্বিত গায়নের গানটির পুরা কপি আমাকে পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত ও আপ্যায়িত হইব। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমার লিখিত "পেয়ার শাহ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়াছেন কি? আপনার কুশল কামনা করি।

ভবদীয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১৩

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বিশেষত আপনার প্রশস্তি[৩০] আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তবে আমি তাহার উপযুক্ত কিনা তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। ইহা আমার সংবর্ধনা গ্রন্থে ছাপা হইতে পারে। মোহিতলাল মজুমদারকে (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ছিলেন) আমি জেলাত ভাই[৩১] বলিতাম। আপনাকে তাই বলিব। আপনি তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করিলেন। আপনাকে সত্বর আমার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ২য় খণ্ড পাঠাইতেছি। ইহাতে পীর গোরাচাঁদের বৃত্তান্ত আছে। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ভবদীয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১৪

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনার কার্ড যথাসময়ে পেয়েছি কিন্তু অফিসের কাজের অতিরিক্ত পুস্তক রচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা সভাসমিতিতে যোগদান ইত্যাদি নানাকার্যে উত্তর দানে বিলম্ব হ'ল, তজ্জন্য দুঃখিত। আপনার প্রবন্ধ (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। অন্য প্রবন্ধ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। আনন্দ-বাজারের প্রবন্ধটিও এখন খুঁজে পাচ্ছি না। যা হোক আপনি কবে নাগাত আপনার বই[৩২] প্রকাশিত করছেন? আমার আশি বৎসর উত্তীর্ণ হবার জন্য সংবর্ধনা[৩৩] বাংলা একাডেমী, বুলবুল একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় করেছে। Asiatic Society of Pakistan, Dacca এবং Linguistic Society of Pakistan Lahore সংবর্ধনা পুস্তক প্রকাশ করছে। আমার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (মধ্যযুগ) শীঘ্র আপনাকে পাঠাবার চেষ্টা করছি। আমি ভাল আছি। আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ইতি –

ভবদীয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

পুঃ আপনার প্রকাশিত পুস্তকটির নাম কি এবং তাতে কি কি প্রবন্ধ থাকবে,[৩৪] জানালে একটি প্রশংসা পত্র সানন্দে পাঠিয়ে দেব। মুঃ শঃ

১৫

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ. বি. এল (ক্যাল) ডিপ্লো-ফোন
ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

ফোন-৪৫৮৪৯
পোয়ারা ভবন
৭৯, বেগম বাজার রোড
ঢাকা ১

১৬. ৫. ১৯৬৭

ভাই গোপেন্দ্র,

এতদিন আফিসের তদতিরিক্ত অনেক কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। সেজন্য অনেক কাল পত্রালাপ করিতে পারি নাই। আমি ১লা এপ্রিল বাংলা একাডেমী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছি। ইহা বোধ হয ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের অনুরূপ। সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু জানাইলে কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। আমার পদে কোন কর্তব্য নির্দিষ্ট নাই। আজীবন মাসিক ভাতা স্বরূপ ৫০০্ টাকা প্রাপ্তব্য। এ পদটি আমার জন্য সর্বপ্রথম সৃষ্ট হইল। যাহা হউক, আমি এতদিনে বন্ধনমুক্ত হইলাম। এই সঙ্গে আমার একটি প্রশংসা পত্র পাঠাইলাম। বইয়ে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষিত হইল।

৭ পৃঃ ববকদেব ··বরকদেব শুদ্ধ বরকতেব···বরকতেব ১০১ পৃঃ ভাগীরপব - শুদ্ধ বাবগোপপুর। গোপজাতি থেকে এই নাম। পীর গোরাচাঁদের প্রথম সেবায়েত বা খাদিম ছিল কিনু ঘোষ কালু ঘোষ। ২৪ পরগণায় ঘুটিয়ারি শবীফেব মুবারক গাজী বা মোরবা গাজী এবং বারাসতের নিকটবর্তী আনোযাবপুরে একদিল শাহ্[৩৫] দু'জন সর্বজনমান্য পীর আছেন। আমার বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডে ইঁহাদের বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি আমার বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড পাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মত সশ্রদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি,[৩৬] পড়িয়া থাকিলে উহা কেমন লাগিল জানাইয়া সুখী করিবেন। আগামী ১০ই জুলাই আমার বয়স ৮২ বৎসব পূর্ণ হইবে। জানি না খোদার মরযী আর কতদিন দুনিয়ায় আছি। আমি এই প্রার্থনা কামনা করি যেন যতদিন সংসারে আছি, কর্মক্ষম থাকি। আমি ভাল আছি। আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

শুভাকাংক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুঃ বন্ধুবর ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ঠিকানা[৩৭] জানাইলে সুখী হইব। মু. শ.

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রণীত "বাংলার লৌকিক দেবতা" পুস্তকখানি গ্রন্থকর্তার অনুসন্ধান গবেষণা এবং তথ্য বিচারের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। তিনি নানাস্থান পর্যটন করিয়া গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি মনে করি, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঠাকুর দেবতা এবং পীর আউলিয়া

সম্বন্ধে অনেক চমৎকার বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য এবং নানা চিত্র সংযোগে সুদৃশ্য। আশা করি ইহা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ব্যক্তির নিকট আদৃত হইবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
Professor Emeritus
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পুঃ ইচ্ছা করিলে ইহা প্রকাশ করিতে পারেন। মু. শ.

১৬

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যকে লিখিত

পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগমবাজার রোড, ঢাকা-১
১২. ১০. ১৯৬৭

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার ২।১০।৬৭ তারিখের পত্র ১০।১০।৬৭ তারিখে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম, তোমার পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি,[৩৮] চিরং জীবতু, সুখী ভবতু।

দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপে জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানাকারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কিনা জানি না।

আমি গত ১লা এপ্রিল বাংলা একাডেমী হইতে অবসর পাইয়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Emeritus Professor-এর পদ স্বীকার করিয়াছি। আমি বাংলা একাডেমীতে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে ১৩২০·০০ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছিলাম। সেখানে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান[৩৯] সম্পাদন শেষ করিয়াছি। তাহার দুই ভল্যুম প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় ভল্যুম যন্ত্রস্থ। আমার দ্বিতীয় কার্য ইসলামী বিশ্বকোষও শেষ হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার ছাপা আরম্ভ হয় নাই। সুনীতিবাবু আঞ্চলিক বাংলা ভাষা অভিধানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন[৪০]। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ৫০০ টাকা সৌজন্যমূলক ভাতা দিবেন। কোন কাজের নির্দেশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিবার কোনও আদেশ নাই। ইহা যাবজ্জীবনের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে আমারই জন্য সর্বপ্রথম এই পদ সৃষ্টি করা হইল। তজ্জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমি এক্ষণে আমার রচিত বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের জন্য ব্যাপৃত আছি। ছাপা শেষ হইলে তোমাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে তোমার গবেষণার অনেক স্বীকৃতি আছে।[৪১]

ড. সুশীলকুমার দে,[৪২] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার,[৪৩] ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,[৪৪] ড. সুকুমার রায় (সেন ?)[৪৫] প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করি। জানি না এ জীবনে এই বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা। সুনীতিবাবু Indian (National) Professor-এর পদ পাইয়াছেন, শুনিয়াছি। উঁহার মাসিক ভাতা কত জানি না[৪৬]। আমি ভাল আছি। আমার ৮৩ বৎসর বয়স চলিতেছে। তোমার দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ইতি

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১৭

আজহারউদ্দীন খানকে লিখিত ১৭-১৮/২

৭৯, বেগম বাজার রোড ঢাকা
১২।৫।১৯৬৭

জনাব,

তসলীম। আপনি পরিশ্রম করিয়া আমার জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,[৪৭] তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনি এই বৃত্তান্ত কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি যাহা আছে, সে সম্বন্ধে অবসরক্রমে আপনাকে জানাইব। যাহা হউক, আমার প্রতি আপনার এই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আগামী বার বিস্তৃত কিছু লিখিব আমি ভাল আছি। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

একান্ত ভবদীয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুঃ নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় উত্তরে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য দুঃখিত। মু. শ.

১৮

৭৮ [৭৯] বেগমবাজার রোড, ঢাকা
১২।১২।৬৭

পরম প্রীতিভাজন,

আসসালাম আলয়কুম্। গতকল্য আপনার তিনখানি পুস্তক[৪৮] পাইলাম। তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আমার বিষয়ে আপনার প্রশ্ন সংবলিত পত্র পূর্বে পাইয়াছি। কিন্তু সাহিত্যিক জরুরি কাজে ব্যাপৃত থাকায় উত্তরের সময় অভাব। সময় পাইলে নিশ্চয়ই উত্তর দিব। বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার জন্য যে সংবর্ধনা গ্রন্থ[৪৯] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্বর আপনাকে পাঠাইতেছি। আমি ভাল আছি। আপনার কুশল কামনা করি। ইতি

ভবদীয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পত্র পরিচিতি

॥ ড. শহীদুল্লাহ্‌কে লিখিত চিঠি ॥

১. রবীন্দ্রনাথের ২ সংখ্যক চিঠি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নয় শুধু তাঁর স্বাক্ষর ছিল। ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন "অষ্টম শ্রেণীর বাংলা রচনা শিক্ষার বই 'প্রবন্ধ মঞ্জরী'র পঞ্চম সংস্করণের (ঢাকা ১৯২৪) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র অংশবিশেষ ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল।" (দেশ সাহিত্য সংখ্যায় ১৩৮৬)

২. রবীন্দ্রনাথের ৩ সংখ্যক পত্র 'ভাষা ও সাহিত্য' (ঢাকা ১৯৩১) বই সম্পর্কে অভিমত।

৩. বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব। 'বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধটি "ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন।

৪. ৪ সংখ্যক চিঠিতে ইংরেজি তারিখের সঙ্গে শেষে বাংলা তারিখ রবীন্দ্রনাথ বসান নি শুধুমাত্র বাংলা সন উল্লেখ করেছেন। ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী সেদিন বাংলা তারিখ হবে ১৬ ভাদ্র ১৩৪৩। চিঠিটি শহীদুল্লাহ্‌ রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩৯৫) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম চিঠিটি শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্‌ সাহেবের বিবাহের আশীর্বাণী।

৬. ২ সংখ্যক চিঠিটি 'রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম' (১৯৪২) অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে সুনীতিকুমারের অভিমত। অভিমতটি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫২) মুদ্রিত হয়েছিল।

॥ ড. **শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের চিঠি** ॥

পত্র ১ ॥

৭. কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের জন্য এটি একটি টাইপ-করা আবেদন পত্র। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট তিনি আবেদন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন। এই একই আবেদন পত্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে গ্রন্থাগারিক পদের জন্য ১৯৪৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'General Secretary, The Royal Asiatic Society of Bengal, 1, Park Street, Calcutta, West Bengal' ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন।

পত্র ৩ ॥

৮. অমর কাব্য—দুটি আরবী গীতিকবিতার গদ্যানুবাদ। 'কসীদতুল বুর্দঃ' মুহম্মদ শরফুদ্দীন বিন সঈদ বিন বুসীরীর রচনা—কবির জীবনীসহ গদ্যানুবাদ

'আল্ ইসলাম' বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কা'ব বিন যুহাব রচিত 'বানত-সু 'আদ' কবিজীবনীসহ গদ্যানুবাদ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে দুটি গদ্যানুবাদ ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে "অমর কাব্য" নামে প্রকাশিত হয় (অক্টোবর ১৯৬৩ ঃ আশ্বিন ১৩৭০)।

পত্র ৪ ॥

৯. অফিসের কাজ বলতে তখন তিনি বাংলা একাডেমীতে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

১০. হুজুর কিবলাঃ মরহুমে মগফুর—মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (১২৫০-১৩৪৫) ফুরফুরার পীর সাহেব। ইনি শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে কুরআন শরীফ-এর বাংলা অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। পীর সাহেব সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একটি প্রবন্ধ 'হযরত মৌলানা শাহ্ সুফী মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী (রঃ) নামে প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে আছে (পৃ ১৮৯-১৯৯. পরিবর্দ্ধিত নতুন সংস্করণ ১৯৭০)।

১১. 'জাগরণ' পত্রিকা- কলকাতার ১২, বলাই দত্ত স্ট্রীট থেকে আবদুল আজীজ আল আমান-এর সম্পাদনায় বৈশাখ ১৩৬৩ থেকে চৈত্র ১৩৬৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সুবাঃ ফাতিহাঃ পৌষ ১৩৬৩ এবং সুবা বকরা ঃ মাঘ ১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, আষাঢ় ১৩৬৪, শ্রাবণ ১৩৬৪, আশ্বিন ১৩৬৪, কার্তিক ১৩৬৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ সংখ্যায় অংশত বেরোয়।

পত্র ৫ ॥

১২ ছোটদের রসূলুল্লাহ (দঃ) (১৯৬২ আগষ্ট ঃ ১৩৬৯ শ্রাবণ) সূচী ঃ ফাতিহাহ্ দুয়াযদহম, হযরত মুহম্মদ (দঃ), হযরতের মদীনায় প্রস্থান, হযরতের অন্তিমকাল, হযরত ও ক্ষমা, হযরত ও দয়া, হযরতের বলা একটি গল্প, ছোটদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (দঃ), হদীস আলাপন, হযরতের চার আসহাব, 'আশবাহ্ মুবাশ শবাহ্', হযরতের বীর সেনানী খালিদ। পৃ [৩]+৮০। ৩, ৪, ৫ এর পত্র প্রাপক আহমদ আলী জামীর নানা (মাতামহ) মুহম্মদ আমানাতুল্লাহ্ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছাত্রবন্ধু ছিলেন। পিয়ারা গ্রামের পাশে আন্দির গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল। সেইসূত্রে জামী সাহেবের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পরিচয় ছিল।

পত্র ৭ ॥

মুহম্মদ নূরুল্লাহ—শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ভাইপো। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহম্মদ খলিলুল্লাহ্র দ্বিতীয় পুত্র।

১৩. অফিসের কার্য বলতে বাংলা একাডেমীতে সম্পাদনার কার্যে লিপ্ত।

১৪. বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড [মধ্যযুগ] ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৫ পৃ ৫৩৩।

১৫. কুরআন শরীফ-এর বঙ্গানুবাদ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।

১৬. সফী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠপুত্র। পুরো নাম - আবুল ফজল মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্‌। জন্ম ঃ ৪ জুলাই ১৯১৫। গ্রন্থ ঃ আধুনিক উপকথা, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে, ইসলামের ঐতিহ্য ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), শহীদুল্লাহ্‌ সংবর্ধনা গ্রন্থ-সম্পাদনা ইত্যাদি। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স সংস্থার মালিক।

১৭. জলিল ভাই –একজন পেয়ারা গ্রামবাসী।

১৮. আবুসালেহ—দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

১৯. মেহেরুল্লাহ—শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের ছোট ভাই খলিলুল্লাহ্‌র পুত্র।

পত্র ৮ ॥

২০. কাজী মুহম্মদ মুস্তাফা হাড়োয়া পি. জি. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্প্রতি পরলোকগত। পিতার নাম ঃ কাজী মোহম্মদ নূর আলী ; ঠিকানা ঃ বাঁদপুর, পোঃ আকুনী, জেলা হুগলী। গ্রন্থ ঃ সাধক জীবন, চূড়ান্ত সমাধান, জিয়ুইয়া প্রসঙ্গ, ইসলামী নাম ও নামকরণ ইত্যাদি।

২১. শেষ নবীর সন্ধানে, ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স ১৯৬১ পৃ [৮+২০] ১০০। সূচী ঃ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ-নবী (দঃ), শেষ নবীর জন্ম, নবুওত প্রাপ্তি ও শবে কদর, শবে মি'রাজ, আকাবার প্রথম অঙ্গীকার, 'শক্কুল কমর' বা চন্দ্র বিদারণ, পরিশিষ্ট ঃ ক. হিজরতের পূর্বে পর্যন্ত প্রধান ঘটনাবলী, খ. মূল আরবী উদ্ধৃতি, নির্ঘণ্ট ॥

২২. ইসলাম প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩। পরিবর্ধিত সং, অক্টোবর ১৯৭০, ঢাকা. রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স পৃ [১২] ২৭৭। ২৭টি প্রবন্ধ আছে।

২৩. শিকওআহ্‌ ও জওআব-ই-শিকওআহ্‌। ঢাকা, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৪২। নতুন সং, ১৯৬৪, ঢাকা রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, পৃ ১০২।

২৪ ইকবাল। ঢাকা ১৯৪৫। পরিবর্তিত নূতন সং ১৯৬৪, ঢাকা রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স পৃ [৮]+১৪৪ সূচী ঃ ইকবাল, ইকবালের গ্রন্থ পরিচয়, ইকবালের বাণী, ইকবাল দর্শনে খোদাতত্ত্ব, ইকবাল ও নবীপ্রেম, ইকবালের জীবনদর্শন, তারানা-ই-মিল্লী, মুনাজাত।

৬ ১১ সংখ্যক চিঠির প্রাপক হাড়োয়ায় পি. জি. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের জন্মস্থান ছিল -- হাড়োয়ায় হাইস্কুল স্থাপনে তিনি সাহায্য।সহায়তা করেছিলেন, গ্রামের থানার হাইস্কুল হওয়ায় তিনি খুশী হয়েছিলেন সেজন্য হাড়োয়ায় হাইস্কুলের গ্রন্থাগারে তিনি তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত পুস্তকের কপি পাঠাতেন। হাড়োয়ায় একটি কলেজ স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হয় –শহীদুল্লাহ সাহেব কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু একর জমি

দান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হাড়োয়ায় কোন কলেজ আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয় নি।

পত্র ১২ ॥

২৫. পীর গোরাচাঁদ প্রসঙ্গ শহীদুল্লাহ্ সাহেব রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র ২য় খণ্ডে আছে পৃ ৪৬৮-৪৭৫ পরিমার্জিত সংস্করণ কার্তিক ১৩৭৪। (প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭১।) ঢাকা রেনেসাঁস প্রিন্টার্স পৃ [দ]+৬১৮

২৬. আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ (১৮৭৫-১৯৫৯)। গ্রন্থ: বিষাদ-সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি, শহীদ তিতুমীর (১৩৬৮)।

২৭. ড. দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। গ্রন্থ: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বৃহৎ বঙ্গ, রামায়ণী কথা প্রভৃতি।

২৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৫৩) নৈহাটি, চব্বিশ পরগণায় জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা। গ্রন্থ: বৌদ্ধগান ও দোহা, বাল্মীকির জয়, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি।

২৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৬৭ বর্ষের ২য় সংখ্যায় 'পেয়ার শাহ্' প্রবন্ধটি প্রকাশিত (পৃ ৭৭-৮৪)। বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডে (১৩৭৪) পেয়ার শাহ্ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আলোচনা আছে (পৃ ৪৭৫-৪৮৪)।

পত্র ১৩ ॥

৩০. আপনার প্রশস্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রশস্তিটি হোল এই—

আচার্য

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব।

এম. এ., বি-এল (ক্যাল); ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট (প্যারিস)

বিদ্যাবাচস্পতি করকমলেষু,

হে দেশ-বরেণ্য পণ্ডিতপ্রবর,

আপনার জীবনের অশীতি-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আপনার অগণিত ভক্তবৃন্দের সহিত আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

কীর্তিমান ব্যক্তি কালজয়ী। বাংলা সাহিত্যে আপনার দান ও কঠোর সাধনালব্ধ আবিষ্কার দেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্নত ও আপনাকে কীর্তিমান করিয়াছে।

আপনার সুদীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন দেশবাসীর পক্ষে দেবতার একটি মহা আশীর্বাদ স্বরূপ।

আপনি বাণীর বরপুত্র —স্নেহধন্য, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী আপনাকে জয়তিলক দিয়াছেন, বিদেশ হইতে আপনি স্বর্ণমাল্য পাইয়াছেন, দেশবাসী জনসাধারণ আপনাকে ভাল-বাসিয়াছে, শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

যাঁরা কিছুকাল পূর্বে ছিলেন বর্তমানে যাঁরা আছেন—পরে যাঁরা আসিবেন—সকলের জন্য আপনার দান অসীম।

কিন্তু সীমা নাই আমাদের আপনার নিকট আশা-আকাঙ্ক্ষার, আমরা বর্তমান ও অনাগত কালের জন্য আপনার নিকট আরও চাই। এজন্য ভগবানের নিকট সমবেতভাবে প্রার্থনা জানাই আরও দীর্ঘকাল আপনাকে কর্মক্ষম রাখুন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

৩রা জুলাই ১৯৬৫। আপনার জন্ম-পল্লীর প্রতিবেশী
চব্বিশ পরগণা লোক-সংস্কৃতির নগণ্য গবেষক
গ্রাম ঃ মজিলপুর শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
ডাকঘর ঃ জয়নগর মজিলপুর

প্রশস্তিটি শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ (মার্চ ১৯৬৭)-এ 'কতিপয় গুণমুগ্ধের পত্রাবলী' অধ্যায়ে মুদ্রিত হয়েছে (পৃ ২২)।

৩১. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) কাঁচড়াপাড়া মাতুলালয়ে জন্ম। কবি ও সমালোচক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সহকর্মী (১৯২৮-১৯৪৪)। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর জন্ম ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে।

পত্র ১৪ ॥

৩২. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'বাংলার লৌকিক দেবতা' (১৯৬৬) তাঁকে এবং সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

৩৩. আশী বছর উত্তীর্ণ হবার জন্য সংবর্ধনা…

তাঁকে সংবর্ধনা জানান ঢাকা বাংলা একাডেমী ৯ই শ্রাবণ ১৩৭২ ঃ ২৫শে জুলাই ১৯৬৫

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১৬ই শ্রাবণ ১৩৭২ ঃ ১লা আগস্ট ১৯৬৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যারূপে (১৩৭২ বর্ষা সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের সংবর্ধনা এবং ঐ বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্যিকীর' শহীদুল্লাহ্ সংখ্যা (১৩৭২ শরৎ সংখ্যা) তাঁর হাতে সমর্পণ করেন।

১৯৬৬, ১০ই জুলাই ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান তাঁকে সংবর্ধনা জানান এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় একটি অভিনন্দন গ্রন্থ Muhammad Shahidullah Felicitation Volume প্রকাশ করেন।

১৯৬৭, ৯ই মে লাহোরের Linguistic Research Group of Pakistan ড. আনোয়ার এস. দীলের সম্পাদনায় Shahidullah Presentation Volume প্রকাশ করেন।

৩৪. প্রকাশিত পুস্তকটির নাম 'বাংলার লৌকিক দেবতা'। সূচী ঃ মাকাল ঠাকুর, পাঁচু ঠাকুর, বনবিবি, আটেশ্বর, কালুরায়, মুণ্ডমূর্তি, ওলাইচণ্ডী, বাবাঠাকুর, বড় খাঁ গাজী, বাসলী, যোগাদ্যা, বড়াম, জ্বরাসুর, রাজবল্লভী, ঢেলাইচণ্ডী, নারায়ণী, হাড়িঝি, সাতবোন, পীর গোরাচাঁদ, বসন্ত রায়, দেবী উত্তরবাহিনী, ইঁদপুজো, রংকিনী, টুসু, ভৈরব, করমবাজা, সিনিদেবী, দক্ষিণরায়, ভাদু, মাণিক পীর, ক্ষেত্রপাল, ঘাঁটু দেবতা, ওলাবিবি, ধর্মঠাকুর, সত্যনারায়ণ সত্যপীর।

'বাংলার লৌকিক দেবতা' নাম বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করেছেন (পৃ ৫৯২)।

পত্র ১৫ ॥

৩৫. বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডে একদিল শাহ পৃ ৪৮৫-৪৮৬ ও মোবারক গাযী পৃ ৪৮৬-৪৮৯ বিবরণ আছে। (১৩৭৪ সং)

৩৬. বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড 'চৈতন্য সাহিত্য' নামে একটি অধ্যায় আছে পৃ ১১৭-১৩৭ (১৩৭৪ সং)।

পত্র ১৬ ॥

৩৭. ড. রাধাগোবিন্দ বসাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন (১৯২১-৩৩)। দু'খণ্ডে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। কলকাতায় তাঁর তৎকালীন ঠিকানা ছিল ৬৯, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা-১৯।

৩৮. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছাত্র প্রখ্যাত লোকসাহিত্যবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ লাভ করার জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেব অভিনন্দন জানান।

৩৯ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (বর্তমানে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান)।

প্রথম খণ্ড -স্বরবর্ণ অংশ, প্রসঙ্গকথা ও ভূমিকাসহ ১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড —ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ক থেকে ট বর্গ ১৩৭২

তৃতীয় খণ্ড –ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ৩ থেকে অবশিষ্ট বর্গ ১৩৭৫

৪০. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন —"I can say that it is a great work of Bengali Academy has undertaken and generations of Bengali speakers whether in India or in East Bengal will be gratefull to Bangla Academy for having taken in hand what promises to be a monumental work. Nothing to this extent has so far appeared in the Bengali language, and the Bangla Academy has set

an example not only to the Bengali speaking people as a whole but also to the rest of India. When Bangla Academy has completed this work, it seem, all that will remain for us to do in West Bengal, would be to supplement it by similar folk-words with illustrative sentences in the remaining districts of Bengal as a whole."

(December 23, 1964, Calcutta)

৪১ বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডে শহীদুল্লাহ্ সাহেব আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম ও তথ্য পৃ ১৬২, ৩৬৮, ৩৭৪, ৩৮১, ৩৮৫, ৫০১, ৪৯৭, ৫৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন (কার্তিক ১৩৭৪ সং) এবং গ্রন্থপঞ্জীতে ড. ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এর নামোল্লেখ করেছেন।

৪২. ড. সুশীলকুমার দে ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বি. এল. ক্লাসের সহপাঠী ছিলেন।

ড সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯২৫-৪৬)। গ্রন্থ ঃ বাংলা প্রবাদ, দীনবন্ধু মিত্র, নানা নিবন্ধ, Sanskrit Poetics ইত্যাদি।

৪৩ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

৪৪. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক।

৪৫. ড. সুকুমার রায় হবে না ড. সুকুমার সেন হবে ভুলবশতঃ 'সেন' 'রায়' হয়েছে। ড. সুকুমার সেন (১৯০১) বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ববিদ।

৪৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পদের নাম National Professor of India in Humanities। তাঁর প্রতি মাসের সাম্মানিক ভাতা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল পাঁচ হাজার টাকা তৎসহ একজন Research Associate ও অফিসের কাজ-কর্ম চালাবার জন্য একজন Office Assistant ছিলেন। অফিস ছিল National Library Campus, Belvedere, Calcutta 27. Phone : 45-5319. ভারত সরকার যাবতীয় খরচ বহন করতেন।

পত্র ১৭ ॥

৪৭. সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার ৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় চৈত্র ২৪, ১৩৭৩, এপ্রিল ৭, ১৯৬৭ প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' (পৃ ৭৯১-৭৯৮)।

পত্র ১৮ ॥

৪৮. বাংলা সাহিত্যে নজরুল, বিলুপ্ত হৃদয়, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল।

৪৯. মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ'।

ঘ. বিবাহের মন্ত্রমালা

[নিজ কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষে শহীদুল্লা সাহেব বিবাহের প্রারম্ভে পাঠের জন্য প্রস্তুত করেন।]

শুভ বিবাহের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক পাঠ

বিস্ মিল্লাহি-র রাহ্মানি-র্ রাহিম।

আল্ হাম্দুলিল্লাহি ; নাহ্' মাদুহু ওআ নাস্তা' ঈনুহু ওআ নাস্তাগ্ ফিরুহু ওআ না'উযু বিল্লাহি মিন্ শুরূরি আন্ফুসিনাা ওআ মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা। মাঁয়্যাহ্দি-ল্লিাহু ফালাা মুদি'ল্লা লাহু ওআ মাঁ য়ুদ্'লিল্ ফালাা হাাদিয়া লাহু। ওআ আশ্হাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লা-ল্লাহু ওআ আশ্হাদু আন্না মুহা'ম্মদান্ 'আবদুহু ওআ রাসূলুহু। য়াা আয়্যুহা-ল্লাযীনা আমানু ত্তাকু'-ল্লাহা হা'ককা তুকা'হিতী ওআ লাা তামতুন্না ইল্লাা ওআ আন্তুম্ মুসলিমূনা। য়াা আয়্যুহাা-ন্নাস ইন্না খালাক্' নাাকুম্ মিন্নাফ সিঁও ওআাহি'দাতিঁও অত্তা খালাকা মিন্হাা যওজাহাা ওআ বাস্সা' মিন্হুমা রিজাালান কাসীরাঁও ওআ নিসাাআঁও ওআ-ত্তকু'-ল্লাাহা-ল্লাাষী তাসাাআলূনা বিহী ওআ ল্আর্ হাঁমা ; ইন্না-ল্লাাহা কাানা 'আলাায়কুম রাক'ীবান্। য়াা আয়্যুহাল্লাযীনা আামানুত্তাকু'-ল্লাাহা ওআকূলু কাওলান্ সাদীদা য়ুস্'লিহ্লা-কুম্ আ'মাালাকুম্ ওআ রাসূ-লাহু ফাকাঁদ ফাাযা ফাওযান্ আযীমান।

অর্থ

॥ দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্র নামে ॥

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র : আমরা তাঁহার প্রশংসা করি, তাহার সাহায্য কামনা করি, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমাদের নিজের প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে ও আমাদের কার্যের অশুভ হইতে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ যাহাকে সুপথ দেখান. তাহার পথভ্রান্তকারী কেহ নাই ; তিনি যাহাকে বিপথে ছাড়িয়া দেন, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, পুনরায় আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। হে ঈমানদার সকল, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাবধান হও, যেমন তাঁহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, এবং তোমরা আমরণ মুসলমান (একান্ত অনুবর্তী) থাকিও। হে মনুষ্য জাতি, আমি তোমাদিগকে একই প্রাণ হইতে সৃষ্টি করিয়াছে। এবং তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছি। পুনরায় উভয় হইতে বহু নরনারী বিস্তৃত করিয়াছি ; সেই আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান হও যাঁহার নাম লইয়া তোমরা পরস্পরের নিকট যাগ্ঞা কর, এবং আত্মীয়তা সম্বন্ধে সাবধান

হও : নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর প্রহরী আছেন। হে ঈমানদার সকল, আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান হও, এবং যথার্থ কথা বল, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কার্য্য সংশোধন করিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের অনুগত হয়, নিশ্চয় সে মহতী সিদ্ধিতে শুদ্ধ হয়।

বিবাহ অন্তে প্রার্থনা

বারাকা-ল্লহু লাকা ওআ বারাকা 'আলায়কা ওআ জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন্।

(হে বর,) আল্লাহ্ তোমাকে সৌভাগ্যবান করুন এবং তোমাকে শ্রীবৃদ্ধি দান করুন এবং (হে বরবধূ,) আল্লাহ্ তোমাদের উভয়কে কল্যাণে সম্মিলিত রাখুন। (আমীন।)

বর ও কন্যার প্রতি

* সদ্ব্যবহারে (পুরুষদের) নারীদের উপর যেরূপ স্বত্ব, তাহাদেরও তদ্রূপ (পুরুষদের উপর স্বত্ব); কিন্তু তাহাদের উপর পুরুষদের উচ্চ পদ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। (কু'র্আন ২। ২২৮)

* তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের বসন স্বরূপ এবং তোমরা তাহাদের বসন স্বরূপ! (কুর্আন্ ২।১৮)

* যখন স্বামী স্ত্রীর পানে চায় এবং স্ত্রী স্বামীর পানে চায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের পানে সদয় ভাবে চা'ন। (হদীস)

* নারী পুরুষের অংশ। (হদীস)

বরের প্রতি

* তাহাদের (স্ত্রীর) সহিত সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত কর। অনন্তর যদি তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা কর, হয়ত তোমরা আল্লাহ্ যাহাতে প্রচুর কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন, এমনটিকে ঘৃণা করিলে (কু'র্আন্ ৪।১৯)

* সকল ঈমানদারের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ঈমানদার, যাহার স্বভাব উত্তম এবং তোমদের মধ্যে সেই উত্তম যে আপনার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (হদীস)

* পৃথিবী একটি সম্পদ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্ম্মিকা স্ত্রী। (হদীস)

কন্যার প্রতি

* অন্তর ধার্ম্মিকা নারীগণ (স্বামীর) অনুগতা, গোপনীয়ের রক্ষাকারিণী, যেমন আল্লাহ্ তাহা রক্ষা করিয়াছেন। (কুর্আন্ ৩।৩৪)

* লোকে যাহা ধনভাণ্ডারের জন্য সংগ্রহ করে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি, তাহার সংবাদ মাকে কি দিব না? তাহা ধার্ম্মিকা স্ত্রী। যখন স্বামী তাহার দিকে

দৃষ্টিপাত করে, সে তাঁহাকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী তাহাকে আদেশ করেন, সে পালন করে, এবং যখন স্বামী অগোচরে থাকেন, সে তাঁহার স্বত্ব রক্ষা করে। (হদীস)

* যে স্ত্রী আপন গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে, তাহাকে আল্লাহ্ চাহিলে, ধর্ম-যোদ্ধার যুদ্ধের সমান মর্যাদা দিবেন। (হদীস)

"নর-নারীর প্রতি"

দুইটি আত্মা পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের, তথা নিজেদের কল্যাণ সাধন করিবে এবং তদ্বারা কল্যাণময়ের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া চির মিলন ভোগ করিবে। ইহাই ইসলামের বিবাহের আদর্শ। এই কল্যাণ সাধন বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই। পুরুষের যেমন কল্যাণ সাধন প্রয়োজন, তদ্রূপ নারীরও! এই কল্যাণ সাধন বিষয়ে নারী পুরুষের সাহায্যকারিণী এবং পুরুষ নারীর সাহায্যকারী। কুরআন শরীফ বলিয়াছেন

> "নারীগণ তোমাদের পুরুষের জন্য বসন স্বরূপ এবং তোমরা পুরুষগণ নারীগণের জন্য বসন স্বরূপ।"

নারী পুরুষের ভোগের জিনিস নহে, তাহারা আদরের পুতুল নহে, পুরুষ কায়ার ছায়া নহে। জীবন যুদ্ধে নারী পুরুষের সহযোগিনী, জীবনের লক্ষ্যপথে নারী পুরুষের সহযাত্রিণী। নারী যদি পুরুষের দাসী হয়, তবে পুরুষও নারীর দাস. ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এইরূপ স্বীকার করে। পুরুষের আত্মগ্রাসিনী নীতির ফলে নারীর স্বত্ব খর্ব্বকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন আসিবেই যেদিন মুসলিম মহিলা কুরআনের দোহাই দিয়া, হদীসের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার ন্যায্য স্বত্ব অধিকার করিবে। যে ইসলাম হযরত আইশাঃ, হযরত ফাতিমা, খাওলা, আস্মা, রাবিয়াঃ, সুলতানা রাজিয়াঃ, চাঁদ সুলতানা, গুলবদন বেগম, যেবুন্নিসা প্রভৃতি বীর, ধীর, কবি. রাজনীতিক, ঐতিহাসিক নারীগণকে জন্ম দিতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ আশাহীন হইতে পারে না।

মন ও শরীরের গঠনের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই নারী অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ। এ-কথা অস্বীকার করার অর্থ প্রকৃতিকে অস্বীকার করা। তাই কুরআনে পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেওয়া হইলেও মেয়েদেরকে তাহাদের প্রাপ্য ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে, —

"ন্যায় সঙ্গতভাবে মেয়েদেরও (পুরুষের) অনুরূপে অধিকার আছে। কিন্তু মর্যাদা পুরুষের তাদের অপেক্ষা এক স্তর ঊর্দ্ধে। আল্লাহ্ শক্তিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন।"

৬ আমার সাহিত্যিক জীবন

[স্কুল জীবনে]

জন্মেছিলাম ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই। জেলা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে। আমার বেহেশ্‌তবাসী পিতা আমার ও আমার ভাই বোনদের জন্ম তারিখ নিজ হাতে লিখে গিয়েছেন।

গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলাম; কিন্তু কত বয়সে তা মনে নেই। এই পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা ও বোধোদয় পড়েছিলাম বলে মনে আছে। বোধ হয় ১০ বছর বয়সের সময় পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় আসি। সেখানে একটা মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। ১৮৯৯ সালে সেখানে থেকে M. E. (Middle English) পাশ করেছিলাম। তারপর ১৯০০-এর জানুয়ারীতে হাওড়া জিলা স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণীতে) ভর্তি হই। স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে ফারসী না নিয়ে সংস্কৃত নিয়েছিলাম। কাজেই স্কুলে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল। কিন্তু আমি ঘরে বসে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। এই স্কুল জীবনেই ভাষা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হ'য়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধুলো না করে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।

বটতলার বাজে উপন্যাস পড়া আমার ভাল লাগত না। তবে কিছু কিছু ইংরেজী ও বাংলা ভাল উপন্যাস ও গল্পের বই পড়েছিলাম; কিন্তু সবগুলোর নাম এখন মনে নেই। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ এবং তাপসমালা এবং পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের মহম্মদ-চরিত প'ড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ছোটবেলায় পাঠশালায় কুরআন শরীফ পড়তে শিখে-ছিলাম ও নমায পড়ার অভ্যাস ছিল।

এই স্কুল জীবনে মোটামুটি ইংরেজী এবং বাংলায় লেখার কিছু পারদর্শিতা জন্মেছিল। যখন ৩য় শ্রেণীতে (বর্তমানে ৮ম শ্রেণীতে) পড়ি, তখন শিক্ষক নারকেল গাছ সম্বন্ধে একটি ইংরেজী-প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন। আমার প্রবন্ধ প'ড়ে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে আমি সেটা লিখেছি। নানা ভাষা ও out বই পড়ার জন্যে ক্লাসের বই বেশী পড়তাম না। স্মৃতিশক্তিটা খুব ভালই ছিল; সেইজন্যে বরাবরই ক্লাসে ২য় বা ৩য় স্থান অধিকার করতাম। ৪র্থ শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় রৌপ্য পদক পেয়েছিলাম। কিন্তু সংস্কৃতে বরাবরই আমি বোধ হয় প্রথম ছিলাম।

ক্লাসে শতাধিক ছাত্র ছিল; কিন্তু কেবলমাত্র দু'টি বৎসর একটিমাত্র আমার মুসলমান সহপাঠী ছিল। সে হচ্ছে আবদুল হামিদ। সে পরবর্তীকালে Pakistan Assembly-র Member হয়েছিল এবং করাচীতেই মারা যায়। হিন্দু সহপাঠীদের সাথে গলায় গলায় ভাব ছিল। তারা একদিন পণ্ডিতমশায়কে খেপাবার জন্যে এক নালিশের অভিনয় করে। তারা বলে "স্যার, আমরা বামুন কায়েতের ছেলে থাকতে, আপনি ঐ মুসলমান ছেলেটাকে বরাবর ফার্ষ্ট ক'রে দেন, এতে আপনি অন্যায় করেন।" তাতে তিনি বলেন, "আমি কি করব ও সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভাল, তোরা তো তেমন লিখতে পারিস না।" পণ্ডিত মশায় আমার নাম মনে রাখতে পারতেন না, তাই আমাকে সিরাজুদ্দৌলা বলতেন।

স্কুল জীবনে হাফিয আমার প্রিয় কবি ছিলেন। তখন কিন্তু ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের হাফিযের গদ্যানুবাদ ছাড়া মূলে ফারসী আমার পড়া হয় নি। আমি ঐ গদ্যানুবাদ থেকে হাফিযের একটা গযলের পদ্যানুবাদ করেছিলাম। সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি।

॥ হাফেজের গজল ॥

মদ, আমোদ গোপন? কেবল অসার। এসেছি মত্তের দলে যা হয় আমার!
কি করিবে ভাগ্য? খুল গ্রন্থি মানসের; খুলে নাই হেন গ্রন্থি চিন্তা দৈবজ্ঞের।
না হও বিস্ময়যুত কাল আবর্তনে, সহস্র কাহিনী হেন কাল-চক্র জানে।
কোবাদ-বামন-জম-কপালে সৃজন, সবিনয়ে করিও এ চষক গ্রহণ।
জমসেদ, কৈকোবাদ কোথায় কে জানে জমের আসন চূর্ণ হইল কেমনে?
আক্ষেপে শীরি'র যেই বিম্ব অধরের, জন্মে দেখি লালা-পুষ্প গোরে ফর্হাদের।
আইস বিনষ্ট হই মদিরা সেবনে, হয়ত এ মরভূমে পাব সেই ধনে।
বুঝিবা জানিত লালা কালের শঠতা, জন্মাবধি তাই এ পাত্র পাণিতা।
রোক্নাবাদ সলিলে ও ঈদ-ক্ষেত্র বায়, বিদেশে যাইতে মোরে ছেড়ে নাহি দেয়।
হয়েছে আমার যাহা প্রেম বেদনায়, না হয় কাহার যেন তাহা পুনরায়।
চমক যদি না ছাড়ি, কি দোষ আমার? জানি না বিশুদ্ধতর কিবা আছে আর?
পিত্ত সুরা হাফেজসম বাদ্য বাজায়ে. উল্লাসিত হিয়া বাঁধা আনন্দ-কৌশেয়ে।

(১৩-৭-০৩)

হাফিযের সুরা যে ঈশ্বর প্রেমের সুরা তা গিরিশবাবুর টীকা থেকে বুঝেছিলাম।

সংস্কৃত পাঠ্য-পুস্তক থেকে এই সময় রামায়ণের এক অংশেরও অনুবাদ করেছিলাম। তাতে রামের বনবাসের পর দশরথের নিকট সারথি সুমন্ত্রের উক্তি ছিল ঃ—

সবাষ্পা সরিৎ সন্তপ্তকলুষোদকা।
প্রম্লানকুসুমা পদ্মিনী ছিল হতশ্রীকা॥
ধ্যানমগ্ন গতিহীন ছিল মৃগদ্বিজ।
রাম-শোকার্ত কানন আছিল নিষ্কূজ॥
জলচর স্থলচর পরাণী সকল।
জড়বৎ হে ভূপতে আছিল নিশ্চল॥
পুরে রাষ্ট্রে হে রাজন্ না দেখি তেমন।
তব সুত হেতু শোক করে না যে জন॥
রাম বিনা অযোধ্যায় আসিলাম ফিরে।
শোকতপ্ত পৌরগণ তাই নিন্দে মোরে॥
রথ-বথ্যা-প্রাসাদ-গবাক্ষে যোষাচয়।
রামে ত্যজি এনু দেখি কাঁদে উভরায়॥
অশ্রু পূর্ণেক্ষণা দীনা কহিলা আমায়।
হা নৃশংস রামে তুই রাখিলি কোথায়॥
মিত্রামিত্র উদাসীন জনের ভিতরে।
আর্ততায় বিশেষ কিছু দেখি না কাহারে॥
শুনি নৃপ করুণ এ সুমন্ত্রবচন।
বাষ্পাকুল-বাক্ দীন কহিলা তখন॥ (২২-২-০৬)

এই সময় আমি বাংলা অক্ষরে আরবী অনুলিখনের একটি নিয়ম করেছিলাম। অবশ্য বর্তমানে এই নিয়মের পরিবর্তন আমি করেছি। আমি এখানে সেই সাবেক নিয়মটি লিখছি ঃ -

বঙ্গাক্ষরে 'আরবী

অনেক সময়ে বঙ্গালার 'আরবী লিখিতে হয়; বিশেষতঃ আজকাল যে রূপে অনেক 'আরবী ও ফারসী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষরে 'আরবী লেখা অপ্রতিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় 'আরবীর অক্ষরান্তর (Transliteration) করিবার কোন নির্দিষ্ট প্রণালী না থাকায় যে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। অনেকে ইহার প্রতিকার করার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের উদ্ভাবিত প্রণালী পূর্ণ নহে। 'নূর-অল-ইমান সমাজ সীন ও সোয়াদ-কে 'ছ' দ্বারা অক্ষরান্তর করেন। যদিও পূর্ববঙ্গের লোক সীন ও ছ-এর পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ, তথাপি বিশুদ্ধ বঙ্গভাষীর নিকট সীন ও ছ-এর উচ্চারণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মারকত, তালা ইত্যাদি স্থানে 'আয়ন অক্ষরান্তর করেন কিন্তু ঈসা, ঈদ, ইত্যাদি শব্দে আয়েন-এর অস্তিত্ব বুঝাইবার কোন উপায় নাই। মাননীয় কোরআনের অনুবাদক মহাশয় জিম-কে জ ও কাফ-কে ক দ্বারা বর্ণান্তর

করেন। বাঙ্গালায় পদ মধ্যস্থিত জ্ব ক্ক জ্জ ও ক্ক-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। ইহাতে এই এক অসুবিধা, দ্বিতীয়তঃ জ্ব ও ক্ক এর প্রকৃত উচ্চারণ জ্‌ও কুও। সুতরাং এই প্রথা সমীচীন নহে।

এই মন্তব্যের পর আমি অনুলিখনের একটি প্রস্তাব করি। আমি আমার প্রথম প্রস্তাবে 'সে', 'হে', 'জাল', 'জোয়াদ', 'তৈ', 'গায়েন' 'ক্বাফ'-এর জন্য নীচে এক ফুটকিযুক্ত স, হ, জ, দ (আরবী উচ্চারণে) ত, গ, ক ; 'জেব' 'সোয়াদ' 'জৈ' এর জন্য নীচে দুই ফুটকিযুক্ত জ, স, জ, ত ; 'জোয়াদ' ফারসী উচ্চারণে জ এর নীচে তিন ফুটকি ; 'জিম' এর জন্য জ ; সীন এর স ; 'স্বীন' এর জন্য শ ; 'আয়েন' এর জন্য 'অ এবং 'ওয়াও' এর জন্য নাগরী ব ছিল। আমার শেষ প্রস্তাবে ইংরেজীতে 'আরবী ফারসীর অনু-লিখন' (transliteration) অনুযায়ী 'হে' 'সোয়াদ' 'জোয়াদ' (ফারসী উচ্চারণে), 'আয়ন' 'কাফ' এর জন্য নীচে এক ফুটকিযুক্ত হ, স, জ, গ, ক ; 'সে' 'জোয়াদ' (আরবী উচ্চারণে), 'তৈ' 'জৈ' এর জন্য নীচে দুই ফুটকিযুক্ত স দ ত জ ; 'জাল' এর জন্য নীচে রেখাযুক্ত জ ; 'জীম' এর জন্য য ; 'জে' এর জ ; 'সীন' এর জন্য স ; 'স্বীন' এর শ, 'হে' এর জন্য 'অ : এবং 'ওয়াও' এর নাগরী ব ছিল। এই প্রস্তাব ১৯০৩ সালের শেষের দিকে, যখন আমি প্রথম (বর্তমান দশম) শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম।

শয়খ সা'দীর পান্দনামার ৩০ ছত্র এই নিয়মে বাংলা অক্ষরে লিখেছিলাম। তার একটা নমুনা নীচে দিচ্ছি :—

দেলা হর কেহ্ বেনেহাদ খোম্বানে করম্।
বোশোদ নামদারে যহানে করম্ ॥
করম্ নামদারে যহানত্ কুনদ্।
করম্ কাম্খারে আমানত্ কুনদ্ ॥
ব্রায়ে করম্ দর্ যহাঁ কার নীস্ত।
রুজ্ঁী করম্ তর্ হীচ্ বাজার নীস্ত। (৯-১২-০৩)

এই স্কুল জীবনেই ভাষাতত্ত্ব শেখার আমার একটা বাতিক ছিল। তার একটা নমুনা নীচে দিচ্ছি :

Imperative Mood

দা ধাতু সংস্কৃত

	Sing	Dual	Plural
1.	দদানি	দদাব	দদাম
2.	দেহি	দত্তম্	দত্ত
3.	দদাতু	দত্তাম্	দদতু

দো | গ্রীক

	Sing	Dual	Plural
1.	×	×	×
2.	দিদু	দিদতন্	দিদতে
3.	দিদতো	দিদতোন	দিদন্তোন, দিদতোসান্

দা | লাতিন

2.	দা	×	দতে

Do English

2.	দো		দো

দাদন্ | পারসী

2.	দেহি দেহ		দেহীদ

দেওয়া | বাঙ্গালা

2.	দেও		দেও

তামিল

2.	দা	...	..

অবশ্য এতে অনেক ভুল ছিল।

এই সময় ধর্ম আলোচনাও আমার একটি বাতিক ছিল। এটি বোধ হয় আমার বংশগত, কারণ আমরা ২৪-পরগণার বিখ্যাত পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে পীর গোরা-চাঁদের বংশানুক্রমে খাদেম। এনট্রেন্স পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে আমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার নকল নীচে দিচ্ছি :-

তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? না, তুমি দেখ নাই; আর পুত্তলিকার মন্দিরে তুমি তাঁহাকে দেখিতেও পাইবে না। তুমি নিজের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর; তাঁহাকে জানিতে পারিবে। তুমি কি নিজের দিকে চক্ষুপাত করিলে? ও চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না--অন্য চক্ষুর প্রয়োজন। জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা একবার নিজের দেহের পানে দেখ। তুমি কি সর্বতোভাবে তোমার মত আর কোন লোক দেখিয়াছ? দোষে গুণে আকৃতি প্রকৃতিতে তুমি যেরূপ সেরূপ আর একটি মানব দেখিয়াছ? অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা কর তাহারা কি দেখিয়াছে? না, তাহারা দেখে নাই, তুমিও দেখ নাই, আমিও দেখি নাই, সমুদয় জগৎ খুঁজিলেও দেখিবার আশা নাই। তবেই দেখ তুমি এক প্রকার অদ্বিতীয় জীব,—তুমি কেন আমরা প্রত্যেকে এক একটি অদ্বিতীয় প্রাণী। যখন আমি অদ্বিতীয়, তুমি অদ্বিতীয়—আমার সমান আর একটি নাই--তখন পরমেশ্বরের স্বরূপ আর একটি কি থাকিতে পারে? না নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না।

তবেই মানিয়া লও ঈশ্বর অদ্বিতীয় বা একমাত্র —একমেবাদ্বিতীয়ম্। হে অবিশ্বাসিন্, দেখ দেখি পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে একাল পর্যন্ত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিনা। দেখ, স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ ব্যতীত এখনও জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না, তখনও হইত না। এখনও যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় তখনও তাহাই হইত। এখন বল আর তখন বল চন্দ্রমা চিরকাল রাত্রিতে আলোকময়, এখনও সেই রজনীতে তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়; এখনও সেই ঋতু বিপর্যয়; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি, সেই জলের তারল্য. সেই লৌহের কাঠিন্য সেই সমুদয় বিদ্যমান। আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না? অন্য সকলকে জিজ্ঞাসা কর—শিক্ষিত, অশিক্ষিত. জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ইতর, ভদ্র, সভ্য, অসভ্য. অসভ্যতম. আস্তিক, নাস্তিক সকলকে জিজ্ঞাসা কর তাহারা পরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ আমার কথার প্রতিধ্বনি করিবে। তুমি পণ্ডিত. তুমি দেখাইতেছ ইহুদী শাস্ত্রানুসারে আদম, খৃষ্টীয় মতানুসারে যীশু, মুসলমান সাধক শামসে তবরেজ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দ্রোণাচার্য, কৃপ ইত্যাদি, চৈনিক শাস্ত্রানুসারে ফাংকু স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন। তুমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের আরও উদাহরণ দেখাইতেছ দেখাও; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন সাধারণ নিয়ম কি একেবারে রহিত, কি উল্টাইয়া গিয়াছে?

(11½ P.M. -1 A.M.) 13 & 14-12-03.

কিন্তু পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ; রাজকীয় ব্যবস্থা পদ্ধতি কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। দেখ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, সোলন, লাইকর্গস, ড্রেকো, আলফ্রেড প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্র অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা কয়জন পালন করে? পক্ষান্তরে ঈশ্বরের বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহার ক্ষমতা আছে? তিনি যে নিয়মে গ্রহগণকে চালিত করিয়াছেন তাহারা ঠিক সেই নিয়মে চলিতেছে, সেই বায়ু বহিতেছে, সেই বৃষ্টিপাত হইতেছে, সেই সরিৎ সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে, সেই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ. সেই অমাবস্যা, পূর্ণিমা। যদি ব্যবস্থাপ্রণেতা জীবিত না থাকেন, তবে ইহারা কেন আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে? আর যদি অন্য কেহ ঈশ্বরপদে স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে কেন বিশ্বের সাধারণ নিয়ম অপরিবর্তিত রহিবে? এই দ্বিতীয় ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোন না কোন নিয়মের পরিবর্তন করিত, হয়তো পৃথিবীর সর্বস্থানে চির-বসন্ত বিরাজমান রাখিত, হয়তো বসুধা কখন চন্দ্রের অদর্শনে কোন কষ্ট ভোগ করিত না, হয়তো পৃথিবীতে দুঃখ একেবারে থাকিত না। কিন্তু তাহা তো হইতেছে না। তবেই স্বীকার কর আদিতে যে ঈশ্বর ছিলেন এখনও সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত; ভৌতিক পদার্থ তাঁহার আজ্ঞাপালনে চির বাধ্য। দিবারজনী সর্বসময়ে, কানন নগর সর্বত্র, সর্বভৌতিক পদার্থ তাঁহার আজ্ঞাবহ। তবেই তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, নতুবা উহারা তাঁহার আজ্ঞা কখনও এরূপে পালন করিত না; আর তিনি জীবন্ত, অটল, নিদ্রা তন্দ্রার বশীভূত নহেন।

তবে যে সময় সময় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার মহাশক্তিই প্রকাশিত হইতেছে। তিনি দেখাইতেছেন, সর্ব পদার্থ প্রকৃতির বশীভূত নহে, তাঁহার ইচ্ছার উপর প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিয়ে প্রকৃতিকে দূরীকৃতা করিতে পারেন। কেহ যেন না বলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীব সৃষ্টি হইতেছে। কেহ যেন না বলে চন্দ্র সূর্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থ স্বাধীন, তাই সূর্যে গ্রহণ আনয়ন করেন, চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি করেন, পূর্ণিমার দিনই তাহাকে গ্রস্ত করান। তাই অত্যুচ্চ প্রদেশে অগ্নির তেজের হ্রাস করেন। তাঁহার আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার কিংকরগণ এসকল কার্য সমাধা করিয়া থাকে। সকলের উচিত মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বরের উপাসনা করে; তাহারা যেন চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি আদির আরাধনা না করে। আর তাহারা যেন মনুষ্যাদি প্রাণীরও উপাসনা না করে। তাই তাহাদিগকে তিনি সংহার করেন রোগ-শোকগ্রস্ত করেন। জ্ঞানীদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে, তাহারা তদ্দ্বারা প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অবুঝগণের প্রতি আক্ষেপ। তাহাদের জন্য অনন্ত শাস্তি।

10 11 A M.) 14-12-03.

এই সময় আমি আমার এক সহপাঠীকে যে পত্র লিখেছিলাম, তাহাতেও আমার ধর্মভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ভাই পঞ্চানন,

চিঠি লিখিতে বসিয়াই তোমার নামের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তোমার নামটি বড় ভাল নয়। পঞ্চমুখ মহাদেবের নামানুসারে তোমার নাম। আমার নাম কা'র নামানুসারে রাখা হ'য়েছে জান? নিরাকার আল্লার নামের সহিত আমার নাম। আকারবিশিষ্ট দেবদেবী তোমাদের পূজ্য, আর নিরাকার ঈশ্বর আমাদের পূজ্য। তোমাদের শাস্ত্রে যে নিরাকার কোন দেবের উল্লেখ আছে তা'ত বোঝায় না। স্বয়ং নারায়ণ শরীরধারী। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নারায়ণের নাভি হইতে জাত পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম। নারায়ণ যদি অশরীরী হইবেন তবে তাঁহার নাভি আসিবে কোথা হইতে? শিব যিনি তিনিও শরীরী। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। শিব যদি নিরাকার হইবেন তবে তাঁর পাঁচ মুখ থাকবে কোথা থেকে? নারায়ণ হইতে জাত ব্রহ্মা যে শরীরী তাহা ত বোঝাই যাইতেছে। তবে দেখ তোমাদের পূজনীয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকলেই শরীরধারী। তোমরা এইসকল শরীরধারী জীবের উপাসনা কর; মুখে বল আর লেখ, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"। কিন্তু এই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের কি পূজা কর?

বাজে কথায় অনেকদূরে আসিয়াছি কাজের কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে জীবনকে তুমি স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিতেছ। আমি বলি জীবন শুধু স্বপ্ন নয়, বরং কুস্বপ্ন। স্বপ্নের সময় আমরা প্রায় পার্থিব বিষয় ভুলিয়া যাই, যেন আমরা অন্য কোন রাজ্যে ভ্রমণ করি। কিন্তু তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। কিন্তু

এ জীবন স্বপ্নে আমরা পারমার্থিক (ঈশ্বর সম্বন্ধীয়) বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি। এ আপন সে পর শুধু এই ভাবিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক যখন এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে তখন দেখিব আমি বা কে, কেই বা আমার। আমি আশ্চর্য হইতেছি। তুমি এ বিষয় বুঝিতে পারিয়াও নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করিতেছ না। যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন জীবন স্বপ্ন, তাঁহারাই জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়াছেন। বলখের রাজা ইব্রাহিম আধম, "মৃত্যু দ্বারা জাগরিত হইবার পূর্বে জাগ্রত হও" এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগী হইয়াছিলেন ; আর এইরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া দস্যু ফাজিল আইয়াজ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আশা করি তুমিও জীবনের গতি ফিরাইবে। প্রথমেই প্রতিজ্ঞা কর একমাত্র নিরাকার জ্ঞানময় ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট মাথা নত করিবে না, আর ইহা কার্যে পরিণত কর তোমার ভাল হইবে।

আমি মাথা পাগলা ; কিন্তু যাহা বলিলাম তাহা সত্য সত্য সত্য।

শুভাকাঙ্ক্ষী

মোহম্মদ শহীদোল্লাহ্

পুনশ্চ ঃ ইতিমধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। যাহা বলিলাম ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া রাখিও। টেষ্ট একজামিনের পর দেখা হইলে যাহা বলিতে হয় বলিও। মোহম্মদ শহীদোল্লাহ্ 24-12-03"

এই সময় দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে আমার একটি রচনার কিয়দংশ এখানে বাংলা অক্ষরে উদ্ধৃত করছি।

॥ সূর্যোদয় মেঁ ভ্রমণ ॥

সূর্য উঠা হৈ। হেম, তুমহারা উঠনা চাহিএ। মুঁহ হাথ ধো ঔর কাপড়া চোপড়া পহিন।

য়হ দিন সুন্দর হৈ ঔর সব পক্ষী গান করতে হৈঁ। আকাশ নীলবর্ণ ঔর বায়ু ঠণ্ডী হৈ। ময়দান মেঁ ঘুমনে কে লীএ য়হ উত্তম সময় হৈ।

চলো হমলোগ ময়দান মেঁ জাএঁ ঔর ছাগ, উসকে বাচ্চে, গৌ, বৃক্ষ ঔর পক্ষী সবকো দেখেঁ।

য়হাঁ এক ঝুপড়ী ঔর এক বৃক্ষ হৈ।

য়হ এক মনোহর কুঞ্জ হৈ। চাহে হম্‌লোগ য়হাঁ বৈঠে চাহে হারিত তৃণ কে উপর বেড়াএ, শীতল সমীরণ সেবন করেঁ, বিহগোঁকে ললীত সংগীত শুনেঁ তথা ছাগশিশুকা নাচনা কুদনা দেখেঁ।

ছাগ বাচ্চো কো মত সাতানা না ফল তুড়না। জো চীজ তুমহারা নেহী হৈ মত লেনা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 26-3-04

এইসময় আমি সংস্কৃত ও পারসীর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করি। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

২১। (ক) প স্থানে ব (বে)

সং	পা	সং	পা
অপ্	আব	তাপ	তাব

(খ) অপরিবর্তিত

সং	পা	সং	পা
পীলু	পীল	পিতৃ	পিদর

(গ) প স্থানে ফ

সং	পা	সং	পা
পত্	ফত্	পবেদ্যুঃ	ফরদা
প্র	ফরা	আপ্ত	যাফ্ত ইত্যাদি

এই সময় Philology of Tamil লিখেছিলাম।

(1) ভ স্থানে প: ভাষা পাষৈ

(2) থ স্থানে ত; অর্থম অর্ত্তম্

(3) ক্ত স্থানে ত্ত; মুক্তা মুত্তু

(4) ন স্থানে দ, নীলম্ দীলম্। ইত্যাদি।

১৯০৪ সালে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম আর আমার স্কুল-জীবন শেষ হ'ল।

GOVERNMENT OF EAST BENGAL

Office of the East Bengal Language Committee

D. O. No. 14 (1500) L. C.

East Bengal Legislative Assembly Building

Ramna, Dacca

The 29th June, 1949

Dear Sir,

The constitutional changed leading to the separation of East Bengal from West Bengal and establishment of Pakistan as free Islamic State have created a new situation which calls for a review of the whole position in regard to the language and literature of the people of East Bengal. The Government of East Bengal have appointed a Language committee (terms of reference in the foot-note) to consider the question in all its aspects and submit recom mendations to the Government. The Committee, therefore, request you to give your considered opinions on the following questions. The Committee will be grateful for opinions and suggestions of all interested in the subject. All opinions suggestions, etc. may be forwarded to the Secretary of the committee so as to reach him by the 20th August, 1949.

The questionnaire below may in particular be replied to and the replies sent likewise.

Yours truly,

Najmul Hussain Choudhury

Secretary,

West Bengal Language Committee.

Please write :

1. Name in full—Muhammad Shahidullah.
2. Academic qualifications—M. A., B. L. (Cal.)
   Dipl. Phone, D. Litt. (Paris).
3. Occupation—Teacher in the Dept. of Bengali,
   Dacca University.
4. Full Postal Address—82, Sarat Chandra Chakravarty Road,
   Dacca.

TERMS OF REFERENCE

1. To consider the question of simplification, reform and standardization of the language of the people of East Bengal (Bengali including Gramnaar Spelling etc.) and to make reccommendations.

2. To suggest methods for coining new words and phrases and for translating as far as possible technical terms and other words from foreign languages for which equivalents do not exist in the said language.

4. To make such other recommendations as the Committee may consider necessary for bringing the said language into harmony and accord with the genius and culture of the people of East Bengal in particular and of Pakistan in general.

Q. 1. Do you consider that Bengali Language needs being simplified in respect of :

(i) Grammar.

A. No. Grammar follows the language. It is the scientific analysis of the language. Unless and until the present Bengali Language is changed, its grammar obviosly cannot be changed or simplified.

(ii) Spelling.

A. Yes, the spelling should be phonetic, especially for the words not common with Sanskrit. The words which Bengali has common with Sanskrit should retain its old spelling. Reforms to be acceptable should be cautious and slow.

(iii) Vocabulary. If so, give your suggestions in respect of each.

A. Yes. Pedantic words borrowed from Sanskrit, Arabic and Persian not ordinarily understood by the people of East Bengal should be eliminated from the vocabulary. But useful words and technical words should be retained.

Q. 2. Do you think that Bengali script should be replaced by any other script such as Arabic or Roman ? If so, please state your reasons for such a change.

A. No. It will shut the door to general knowledge. Moreover Arabic script for Bengal is scientifically retrogressive. It is also cumbrous for writing, printing and typing. Urdu books and journals are all lithographed, is a warning to us.

Q. 3. If you do not advocate a change of script would you reform the present script ? If so how ?

A. Yes. By doing a way with uncouth combinations of consonants by simple juxtaposition as হ্ম, ক্ষ etc. by হ্‌ম, কষ etc. The vowels may also be unified as অ আ অি অী etc as in Tibetain.

Q. 4. In view of the diversity in the forms of written Bengali, do you consider it desirable that common standardised form of the language should be evolved ?

If so, what are your suggestions as to how it should be done ?

A. We have a standard Bengali সাধুভাষা। We have also a common standard colloquial Bengali. This should be encouraged. To create another standard language is uncalled for. A standard language is a growth of centuries by slow evolution. To replace it by a fiat is most undesirable. For example, it is simply useless to replace আমি যাইব (or যাব) না or আমি যামু না or আমি যাইবাম না or আমি যাইতাম ন or আঁই না যায়ুম as found in the different dialects of East Bengal, even if it is possible to arrive at a concensus.

Q. 5. Do you consider it desirable that a basic Bengali language should be evolved on the lines of Ogden's Basic English ? If so, what are your suggestions ?

A. Yes for adult education only.

It is necessary to attribute the essential words of Bengali, as 850 words in Basic English, before we can have a Basic Bengali, Research work is necessary for this. It cannot, however, replace the standard Bengali.

Q. 6. What methods or principles should, in your opinion, be followed in general for :—

(i) Coining new words and phrases.

A. For religious words we should borrow from Arabic and Persian. But for other purposes consistantly with the history of the language we should mainly depend on Sanskrit. When and if Arabic made the State Language of Pakistan, so that its knowledge is made universal for all educated Pakistanis, we may then think of replacing Sanskrit by Arabic for the source of Bengali.

Q. (ii) Translating technical terms and other words from foreign languages for which equivalents do not exist in Bengali ?

A. I would suggest to borrow those technical words in toto as oxygen, hydrogen, proton, electron etc. Arabs also borrowed from Greek as falsafa, Jiughrafia, alabastor etc.

Q. 7. Would you advocate a standard system of transiliteration of foreign words particularly Arabic, Persian, Urdu and English ?

If so, please suggest a method with special emphasis on the correct pronounciation as far as practicable of the original words.

A. Yes, it is necessary to have a scientific transliteration and also a common transliteration for Arabic and Persian. I have given a detailed scheme in my Bengali Grammar p. 367. For scientific transliteration it will be necessary to show all the different letters of Arabic by different divice. For common purpose, I should use স for s sounds generally, শ for sh sounds generally, য for z sounds generally. Long vowels are to be represented by ঈকার and ঊকার।

Q. 8. Have you any other suggestions to make for bringing the Bengali Language into harmony and accord with the genius and culture of the people of East Bengal in particular and of Pakistan in general ?

A. The Bengali language in East Bengal may use such words as are peculiar to it, but which express new ideas and thoughts. It should also freely use such words as are of common use among the masses of people as পানি, খোদা, আল্লাহ্, নানা, দাদা, চাচা etc.

Q. 9. Have you any suggestion to offer to introduce Islamic ideology in Bengali literature ?

A. First of all it is necessary to translate Islamic books from Arabic, Persian and Urdu into Bengali. Then Islamic ideology will gradually permeate the Bengali literature. Cf. the influance of the English Bible on the English language.

Q. 10. If you consider any of your suggestions likely to adversely affect the educational and cultural interests of the minorities, what safeguard would you like to provide for them ?

A. In the matter of language, script and literature the minorities should given fullest freedom, in so far as it is not in any way dangerous to the State.

Signature —Md. Shahidullah
Date—18. 8. 49

ছ. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

মুহম্মদ শহীদুল্লার সঙ্গে ছাত্রাবস্থায়ই আমার পরিচয় হয় (১৯১০-১২) এবং পরে ইহা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় এম. এ. পড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু কোন কোন অধ্যাপক এই বলিয়া আপত্তি করেন যে এম. এ. পড়িতে হইলে বেদ পাঠ করিতে হয় এবং কোন অহিন্দুকে তাঁহারা বেদ পড়াইবেন না। আমিও তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাসের ছাত্র সুতরাং ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন হয় এবং এই উপলক্ষে শহীদুল্লা ছাত্র সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা তখন তর্ক করিতাম যে খ্রীষ্টান সাহেবদের সম্পাদিত ঋগ্বেদ পাঠ্য করিলে যদি দোষ না হয় তবে ভারতীয় একজন মুসলমান বেদ পাঠ করিলে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে। যতদূর মনে পড়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আপত্তিকারী পণ্ডিতদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিতে না পারিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়া শহীদুল্লাকে সংস্কৃত পড়িবার সুযোগ দিয়েছিলেন। Comparative Philology বিষয়ে শহীদুল্লা এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হইলেন এবং ইহা পড়িতে হইলে সংস্কৃতও পড়িতে হইত। এইভাবে শহীদুল্লা কেবল সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইলেন না তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ হইলেন এবং ইহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ও শহীদুল্লাহ একই সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। শহীদুল্লা প্রথমে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন পরে রিডার (Reader) ও ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ইহা ছাড়া তিনি মুসলিম হলের House-Tutor ছিলেন। একুশ বৎসর একসঙ্গে ঢাকায় চাকরি করার ফলে আমাদের পূর্ব সৌহার্দ্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকায় আমরা কাছাকাছি দুই বাড়ীতে থাকিতাম এবং প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। শহীদুল্লা অতি সরল-চিত্ত সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার বন্ধুবৎসলতার কত কাহিনী আজিও স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া আছে। শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি তাঁহার আজীবন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার মনে কখনও কোন সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানের লক্ষণ দেখি নাই।

আমি ১৯২৮ সনে ইউরোপে যাই। শহীদুল্লা তখন প্যারিসে অধ্যয়ন করিতেছিলেন—আমি তাঁহাকেই চিঠি লিখি এবং তিনি যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলেই আমার জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়াছিলেন। সেই সুদূর বিদেশেও তিনি নিষ্ঠার সহিত স্বীয় ধর্মমত পালন করিয়া চলিতেন। তাঁহার একটি 'বদনা' ছিল এবং জবাই

না করা হইলে সে মাংস খাইতেন না। প্যারিসে অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা আমাকে বলিত 'শহীদুল্লাকে দেখিলেই 'Hindu' (ফরাসীদের মতে ভারতীয় মাত্রেই হিন্দু) বলিয়া চেনা যায় কিন্তু তোমাকে হিন্দু বলিয়া মনে হয় না' ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি করিতাম।

শহীদুল্লা জীবনভোর অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন এখনও করিতেছেন। আজ আমরা দুইজনেই বৃদ্ধ -শহীদুল্লার সম্বর্ধনা উপলক্ষে এই কয়টি কথা লিখিলাম -শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি প্রায় ষাট বছরের এই পুরাতন বন্ধু সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

সমাপ্ত